বঙ্গের মোহ

বন্ধের মোহ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

"ভালবাস, পুড়িতে হইবে।"
—উদ্ভ্রান্ত প্রেম

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

[মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

কলিকাতা

প্রিণ্টার

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

উৎসর্গ

যিনি

"বঙ্গের মোহের" আদর্শীভূতা,

তাঁহার উদ্দেশ্যে,

—তাঁহার অগোচরে,—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা

"বম্বের মোহ" ও অপর দুইটি আখ্যায়িকাতে নবযুগের বাঙ্গালীর বহির্জ্জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সে-জীবনের কেন্দ্র বম্বে প্রেসিডেন্সি, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র।

বাঙ্গালীর বহির্জ্জীবন যে রোমান্স-প্রধান, সে-রকম কিছু বলা অবশ্য এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। রোমান্সের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর অন্তরের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতের জাতিসকলের মধ্যে বাঙ্গালী অনুভূতি-প্রবণ বলিয়া পরিচিত। ইহা সদ্‌গুণ কি দুর্গুণ, সে-কথা বলা কঠিন। তবে ইহা যে বাঙ্গালী-চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য, এ-কথা আমি দীর্ঘকাল মহারাষ্ট্রে বাস করিয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। কারণ, এদিক দিয়া মহারাষ্ট্র-বাসীর স্বভাব বাঙ্গালীর প্রায় বিপরীত। পরস্পরের সান্নিধ্যে বিপরীত গুণগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। মহারাষ্ট্র-জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে বাঙ্গালী-চরিত্রের ভাব-প্রবণতা ও আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে বাস্তব-রূপে প্রদর্শিত করা এ পুস্তকের একটা উদ্দেশ্য।

"বম্বের মোহ" ১৩৩৭—৩৮ সনের এবং "তিন-সপ্তাহ" ও "রক্তের টান" তার পরের "বিচিত্রা"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বিচিত্রা" হইতে "বম্বের মোহ" মারাঠী ভাষায় শ্রীযুক্ত জি, এস, হুপরিকর এম, এ দ্বারা অনূদিত হইয়া "মোহময়ী" নামে "কলাদর্শ" পত্রে ধারাবাহিকরূপে

প্রকাশিত হইয়াছে। বম্বে (মারাঠী, মুম্বই) -কে সংস্কৃত ভাষায় "মোহময়ী" বলা হইয়া থাকে। দ্ব্যর্থকভাবে "মোহময়ী" নামটি এ পুস্তকের পক্ষে খুবই খাটে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উভয় অর্থ বোধগম্য হইবে না, তাই আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও এ পুস্তকের জন্য সে নাম গ্রহণ করিলাম না।

প্রয়াগ,
বিজয়া দশমী, ১৩৪১

গ্রন্থকার

স্থূচী

বন্ধের মোহ



সেবার কলোম্বো ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে আমাকে বহুবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। আমি প্রায়ই মালের জাহাজে যাইতাম, তাই আমার সঙ্গী থাকিত মাঝি-মাল্লা আর জাহাজের কর্ম্মচারী। দিনগুলি কষ্টে কাটিত। এমন লোক মিলিত না যাহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলা যায়। শুধু জল আর আকাশ দেখিতে দেখিতে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত।

এক যাত্রায় এক উপযুক্ত সঙ্গী জুটিল। বেতার-যন্ত্রের কর্ম্মচারী বাঙ্গালী। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা হইয়া গেল। সে যুবাবয়সী, কর্ম্মঠ। মনটা ছিল তাহার সতেজ, কিন্তু যেন বিষাদে ম্লান। এক এক সময়ে যখন তাহার কাছে যাইতাম, দেখিতাম, যুবক সমুদ্রের পানে নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে, আর কি যেন একটা গভীর বেদনার ছায়া তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে কথার কোনও উত্তর দিত না।

কিন্তু সে আমাকে খুব অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করিল। পরিচয়ের তিন চার দিন পরেই বলিল, "আপনি আমাকে 'তুমি' বল্‌বেন, আর 'রমেন' ব'লে ডাকবেন।"

ধীরে ধীরে সে আমার কাছে তাহার অন্তরটি খুলিয়া ধরিতে লাগিল।

ছয় বৎসর আগে সে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িত। হঠাৎ তাহার পিতৃ-বিয়োগ হওয়াতে পড়া শেষ করিতে পারিল না। কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতার এক সওদাগরী আফিসে চাকুরি লইল। কিছুকাল পরে তাহার মা'ও মারা গেলেন। তখন সে বাঙ্গলা ছাড়িয়া বর্ম্মাদেশে চলিয়া গেল, এবং এক কন্ট্রাক্‌টারের অধীনে ঠিকাদারি করিতে লাগিল। তখন যুদ্ধ চলিতেছিল। মেসোপোটেমিয়ায় কাজের জন্য পাশ ফেল সব রকম লোককেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে লওয়া হইত। রমেন্দ্র ছয় মাসের চুক্তিতে ওভারসিয়ারের পদ গ্রহণ করিয়া মেসোপোটেমিয়া গেল। যুদ্ধ-শেষে ঈজিপ্টের সামরিক আফিসে কিছুকাল কেরাণীর কাজ করিল। সে-কাজ ফুরাইলে বম্বে আসিয়া রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এক স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু এক বৎসর না যাইতেই সে-কাজ ছাড়িয়া জাহাজের বেতার যন্ত্রচালক হইয়া রমেন্দ্র ভারত সমুদ্রের উপর ভাসিল।

এ সকল খবর দিয়া রমেন বলিল, "বাকী জীবনটা সমুদ্রের উপর কেটে গেলেই বাঁচি।"

যুবকের এ উদাস ভাবে আমি বিস্মিত হইলাম। অবশ্য লক্ষ্যহীন-ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে মানুষমাত্রেরই মনে একটা ক্লান্তি আসে। তখন জলে হউক, স্থলে হউক, কোথাও একটা স্থায়ী ঠাঁই করিতে পারিলে আর নড়িবার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এ তরুণ বয়সে

স্থলের প্রতি বিরাগ ভাবটা আমার কাছে বড়ই বিসদৃশ লাগিল। আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

তাহাতে হঠাৎ যুবকের মুখ কালিমায় ছাইয়া গেল। তাহার সুন্দর চোখদুটি বিষাদের আবেশে এক অনির্ব্বচনীয় স্থৈর্য্য অবলম্বন করিল। সে যাত্রায় আর বেশী কিছু জানিবার সুযোগ হয় নাই।

ফিরিবার পথে আমি অপর এক জাহাজে আসিলাম। কিন্তু তার পরের যাত্রায় আবার সেই জাহাজে চড়িলাম। রমেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমাকে অতি নিকট বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল। তার পর যখন জানিল, আমি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গে গিয়াছিলাম এবং এখন সেখান হইতেই আসিতেছি, তখন কি যেন একটা নিবিড় আকর্ষণে সে আমার কাছে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে যুবকের সঙ্গে আমার গভীর সখ্যভাব স্থাপিত হইল। দিনের পর দিন সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা প্রকারে বঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কি যেন একটা অতৃপ্তি, একটা আকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে জাগরিত হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছিল। একটা গভীর নৈরাশ্য এক একবার তাহার স্বাভাবিক উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতেছিল।

একদিন হঠাৎ সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বহুকালের রুদ্ধ আবেগ ছাড়া পাইল। সে সারা রাত ধরিয়া তাহার ক্যাবিনে বসিয়া আমার কাছে তাহার প্রাণের গূঢ়তম রহস্য ব্যক্ত করিল।

অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া জলরাশি আলোড়িত করিতে করিতে জাহাজখানা ছুটিয়া চলিয়াছিল, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণ প্রাণের কাহিনী উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রোতার হৃদয়ের উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল।

রমেন্দ্রনাথের কাহিনী

১

একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, স্বর্গ হইতে একটা আস্ত মানুষকে দুইভাগ করিয়া পৃথিবীতে পাঠানো হয়। পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেকে অর্দ্ধেক। একভাগ যখন অপর ভাগকে দেখিতে পায় তখন তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। এই আকর্ষণের নামই প্রেম।

সেদিন শান্ত অপরাহ্নে বম্বের সমুদ্রকূলে যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন সেই প্রাচীন কথাটা আমার কাছে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। দৃষ্টিমাত্রেই ভাবিয়াছিলাম, আমি যেন যুগ যুগ ধরিয়া তাহারই অপেক্ষা করিয়া আছি। যেন সে শুধু আমার, আমার সমস্ত কল্পনার, সমস্ত আশার পরিসমাপ্তি।...

কেমন করিয়া এ ভাব হইল জানি না। প্রেমে পড়ায় আমি অভ্যস্ত নই। পূর্ব্বে কোনও দিন কাহারও প্রেমে পড়ি নাই।... কাহারও প্রেমে পড়ি নাই কথাটা নিখুঁত সত্য, যদিও সমস্ত কর্ম্মের মাঝখানে একটা অজানা অচেনা মানসী প্রতিমা দিবানিশি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত। আজ তাহার মধ্যে সে কল্পময়ী মূর্ত্তি বাস্তব হইয়া উঠিল। তাহার সুগঠিত তীক্ষ্ণ নাসিকা আমার কাছে নারীত্বের মধুরতম ব্যঞ্জনা দিয়া গেল। তাহার অধরের রেখাটি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আভাস আনিল। আর তাহার চক্ষুর দৃষ্টি—জানি না জগতে এমনটি আর কোথাও আছে কিনা—তাহা হইতে যেন মানব-প্রাণের কোন অনাবিষ্কৃত রাজ্যের আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল; তাহা যত সুন্দর তত করুণ, যত গভীর তত নির্ম্মল। যেন মানবের

সমস্ত ব্যথা সমস্ত আনন্দ নিঙ্‌ড়াইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া সে চাহনিতে মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

চৌপাটিতে সে একা বেড়াইতেছিল। জনতা ছাড়িয়া একটু একান্তে ধীরপদে যাইতেছিল। নীল রঙ্গের মারাঠী শাড়ী সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাহার দেহের রেখা-সমষ্টিকে চিত্রের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। আমি কাছে গিয়া যখন তাহার দিকে চাহিলাম, তখন সে সরল সহজভাবে তাহার স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি ক্ষণকাল আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়া রাখিল। মনে হইল, যেন সেও এক পরিচিতের সন্ধান পাইয়াছে।...

কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ফিরিবার পথে হঠাৎ চোখে পড়িল, সেও পাশ দিয়া চলিতেছে। আমাকে কাছে আসিতে দেখিয়া সে একটু থামিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই তাহা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের তরে আবার তাহার স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ করিল। মনে হইল, যেন তাহার অন্তরের সমস্ত নির্ম্মলতা, সমস্ত মাধুর্য্য তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভাবিলাম, হয়ত আমার বাঙ্গালীর পোযাক দেখিয়া নারীসুলভ কৌতূহলের বশে সে চাহিয়া আছে। যখন কাছে আসিলাম, তখন সে এক বর্ষীয়সী মহিলাকে মারাঠীতে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "আজ এখানে সভা হবার কথা ছিল, হ'ল'না?" মহিলাটি "সভা? এখানে?" বলিয়া ভাবিতেছিলেন এবং আমাকে সামনে পাইয়া বলিলেন, "এখানে সভা কখন হবে, বলতে পারেন কি?" আমি বলিলাম, "সভা তো আজ নয়, আগামী কাল।" মেয়েটি "ও!" বলিয়া লজ্জায় মুখ নোয়াইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। আমি পাশেই চলিতেছিলাম। মেয়েটির দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "আপনি সভার জন্য এসেছিলেন, বুঝি?" সে খুব

সংযত, অনেকটা আড়ষ্ট, ভাবে বলিল, "হ্যা।" কিন্তু পরক্ষণেই সংযম একটু ভাঙ্গিয়া গেল। আমার দিকে ঈষৎ হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, "আপনি বাঙ্গালী ?"

আমি বলিলাম, "কেমন ক'রে জানলেন ?"

সে বলিল, "কেন, জানা কি খুব কঠিন কথা ?"

তখন উভয়ে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি। আমি বলিলাম, "আপনি কাল সভায় আসবেন ?"

"হ্যা আস্‌ব" বলিয়া সে দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া চলিয়া গেল।

২

পরদিন চৌপাটিতে গিয়া দেখি, বিরাট্ সভা। স্বেচ্ছাসেবকেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিপুল জনতা দাঁড়াইয়াছে, বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখে মেয়েরা সংঘবদ্ধ হইয়া বসিয়াছে। অধ্যক্ষ ও বক্তারা আসিলেন, জয়জয়কারে আকাশ বিদীর্ণ হইল। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইহুদী, খৃষ্টান, মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী, মাদ্রাসী, সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী—সকলের কণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া এক অভিনব একতা ঘোষণা করিল। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, শুনিতে লাগিলাম। একটা অব্যক্ত বিস্ময়ে প্রাণ ভরিয়া গেল। সেখানে আড়াই ঘণ্টা কাল মন্ত্রমুগ্ধের মত কাটিল।

সভা ভাঙ্গিলে হঠাৎ যেন একটা লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। বক্ষরক্ত আলোড়িত করিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল একটি নারীমুখ, জ্যোৎস্নার মত রং, দেব-প্রতিমার মত গড়ন···আর তাহাতে গত দিনের একটু লজ্জামাখা মিষ্টি হাসি !

জনস্রোতের মধ্যে সে মুখখানি খুঁজিলাম, পাইলাম না।

৩

ইহার মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মালাবার হিলের শূন্য-উদ্যান হইতে ফিরিতেছি এমন সময় দেখিলাম, একজন লোক আমার অনুসরণ করিতেছে। তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সে আমার কাছে আসিয়া পড়িল। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মুখ সম্পূর্ণ অপরিচিত। হঠাৎ মনে হইল, এ প্রবাসী বাঙ্গালীর অনুচারী গোয়েন্দা নয় তো? ভাবিয়া মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আগন্তুক আমার পাশাপাশি আসিয়া আমাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পোষাক দেখিয়া মনে হইল, অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু অশিক্ষিত।

চোখে চোখে দৃষ্টি পড়াতে লোকটি থতমত খাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি চাও?" সে মারাঠী হিন্দি মিশাইয়া বলিল, "কিছু না, আপনি কোন্ দেশী লোক, তাই দেখ্‌ছিলাম।" ও-রকম সরল সোজা দৃষ্টি গোয়েন্দার হইতে পারে না। আমি সকৌতুকে বলিলাম, "কি দেখ্‌লে?" সে বলিল, "আপনি কি বাঙ্গালী?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ।" সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল।

তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ইহার মধ্যে কোনও ব্যাপার আছে কি না দেখিবার জন্য একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাতে আবার বাগানে উঠিতে লাগিলাম। সে বাগানের পশ্চিমের সীমায় চলিয়া গেল। আমিও একটু পাশ ফিরিয়া সেদিকে চলিলাম। নীচেই সমুদ্র, অস্তরবির রক্ত-রশ্মিতে কল্পলোকের মত দেখাইতেছিল।

লোকটি যাইতেই বেঞ্চ হইতে একটি সুবেশা মহিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম—সে! লোকটিকে সাগ্রহে কি

জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি নীচের রাস্তার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

ধীরে ধীরে আমি তাহাদের কাছে গেলাম। আমাকে দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। মেয়েটি লজ্জায় মাথা নোয়াইয়া লইল। আমি বলিলাম, "আপনি বুঝি এঁকে পাঠিয়েছিলেন?" লজ্জায় তাহার কানদুটি লাল হইয়া উঠিল।

তাহার সঙ্গী বলিল, "আমরা আপনাকে দূর থেকে নেমে যেতে দেখেছিলাম। রেবা বল্‌লে, 'আপনি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী।' আমি বল্‌লাম, 'তা কেমন করে বলা যায়?' রেবা বল্‌লে, 'কাছে গিয়ে দেখে এসো।' তাই আমি দেখতে গেলাম। আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কি করে, বাবু-সাহেব?"

আমি বল্‌লাম, "যাদুবলে।" তিন জনেই হাসিলাম। কারণ, এ দেশে প্রবাদ আছে যে, বাঙ্গালীরা যাদুকর।

আমি রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি আপনার কে হন?'

সে মাথা ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভাই।"

আমি বলিলাম, "সেদিন তো সভায় আপনার দেখা পেলাম না।"

যে ধীর সলজ্জ হাসির সহিত বলিল, "সেদিন দামুকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আপনি চলে গেলেন।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "আপনি তা হ'লে সভায় গিয়েছিলেন?"

সে বলিল, "হ্যাঁ। দেরী হয়েছিল, তাই পেছনে বসেছিলাম।' তারপর একটু থামিয়া বলিল, "এত মেয়েদের মধ্যে আপনি বোধ হয় আমাকে দেখ্‌তে পান্ নি। কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছিলাম; সভা শেষ হ'তেই আপনার খোঁজে পাঠিয়েছিলাম।"

তাহার শেষ কথাগুলিতে তাহাকে আমার এমন পরিচিতের মত, আত্মীয়ের মত লাগিল যে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রেবা বলিল, "আজ সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখন বাড়ী যেতে হবে।" বলিয়া সঙ্গীর দিকে তাকাইল।

আমি বলিলাম, "আপনি বুঝি এখানে সর্ব্বদাই বেড়াতে আসেন?"

রেবা বলিল, "আসি, মাঝে মাঝে।"

আমি দামুর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "আপনার পূরো নাম কি?" সে পকেট হইতে একখানা ছোট কার্ড বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। তাহাতে লেখা ছিল,—

দামোদর হরি ফডনীস।

কাপাসের দালাল।

সেই ইটালিক অক্ষরে মুদ্রিত কার্ড, আর তাহার মালিকের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিয়া আমি ঈষৎ হাসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের বাড়ী কোথায়?"

দামোদর রাস্তার নাম করিল। রেবা তার সঙ্গে বাড়ীরও নাম করিল। তারপর দামোদরের কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। দামু বলিল, "বাবু-সাহেব, আমাদের বাড়ী কবে আস্‌বেন?"

"আপনাদের বাড়ী?" বলিয়া আমি একটু বিস্ময়ের সহিত তাহাদের দিকে তাকাইলাম। রেবার গাল দুটি জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এ দীর্ঘ একমাস ধরিয়া যে শুধু কল্পনা-রাজ্যে একটা স্বপ্নের মত খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে, যাহাকে মনে করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের তরে পাইয়া চিরকালের জন্য হারাইয়াছি, আজ সে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছে, "আমাদের বাড়ী কবে আস্‌বেন?"

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আস্‌ব একদিন।"

তখন উভয়ে যত্ন করিয়া বাড়ীর ঠিকানা, কত নম্বর ট্রামে যাইতে হয়, সমস্ত বলিয়া বিশেষ হৃদ্যতার সহিত আবার নিমন্ত্রণ করিল। তারপর বাগান হইতে নামিয়া অতি ভদ্রভাবে বিদায় লইল।

আমি বিহ্বলচিত্তে গৃহে ফিরিলাম।

৪

সপ্তাহখানেক পরে একদিন খেতওয়াড়ীর এক রাস্তায় ট্রাম হইতে নামিলাম। বম্বের খেতওয়াড়ীর মত এমন জন-বহুল স্থান পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ ভারতে নাই। সারি সারি ছয়তলা দালান, আর তাহাদের প্রত্যেকটি বহু খণ্ডে বিভক্ত। এক এক খণ্ড লইয়া এক একটি পরিবার বাস করে। আমি "কৃষ্ণসদনের" খোঁজে ব্যস্ত হইলাম। কেউ বলিল, "সাম্‌নে যান, পাবেন।" সাম্‌নে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "পেছনে ফেলে এসেছেন।" এরূপভাবে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে অবশেষে বাড়ী মিলিল, কিন্তু তাহার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া চারতলায় উঠিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। সেখানে গিয়া অবশ্য অতি সহজেই দামোদর হরি ফডনীসের নামের পিতলের ফলক পাওয়া গেল। চারতলায় বেশ বড় একটা ব্লক দখল করিয়া ছিল তাহারা। বারান্দায় নানা রকমের ফুলের টব গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দিতেছিল।

দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, "মিষ্টার ফডনীস্‌!" দামোদর ঘরে ছিল না, রেবা ছিল। সে দরজায় আসিল এবং আমাকে দেখিয়াই অতি আগ্রহের সহিত ঘরের ভিতর লইয়া গেল। দেখিলাম, ঘরখানি বেশ সুসজ্জিত, যদিও আসবাবের সংখ্যা কম।

রেবা একখানি সাধারণ কাপড় পরিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভিতর

দিয়াও তারুণ্যের অমল দীপ্তি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে আমাকে একটা কৌচে বসাইয়া সাম্‌নে একটি টিপয় রাখিল, তাহার উপর দৈনিক কাগজ ও কয়েকখানা বই ছিল। "আপনি একটু বসুন, আমি আস্‌ছি" বলিয়া, পর্দ্দা সরাইয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

আমি বইগুলি দেখিতে লাগিলাম। প্রত্যেক বইয়ে নাম লেখা ছিল, "রেবাতাঙ্গী ফডনীস, ইণ্টার ক্লাস, সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ।"

একখানি রঙিন ফিন্‌ফিনে সাড়ী পরিয়া রেবা ফিরিয়া আসিল। দুঃখ করিয়া বলিল, "আপনাকে একা বসিয়ে রাখলাম!" তারপর বলিতে লাগিল, "দামু বাইরে গেছে; সে মোটেই ভাবে নাই, আপনি আজ আস্‌বেন। আমরা আপনার অপেক্ষা করে করে এক রকম আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।"

কথা বলিতে বলিতে সে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে বাহিরে দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন একটু বয়স্কা; বয়স হয়ত কুড়ির উপর হইবে। এখন মনে হইল, অতি তরুণ, আঠারোর বেশী হইতে পারে না। শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে কেমন একটা বালিকা-সুলভ কোমলতা খেলিয়া যাইতেছিল।

সেদিন বাহিরে যে সলজ্জভাব দেখাইয়াছিল, ঘরে তাহার চিহ্নও ছিল না। সে হাসিমুখে, বেশ সহজভাবে, আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। পাশের দেওয়ালে ঝোলানো একটা বড় আয়নাতে তাহার আবক্ষ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। দেখিলাম, আয়নার উল্টা প্রতিচ্ছায়াতে বাস্তব রূপটা যেন ঠিক ঠিক ধরা পড়ে নাই। মুহূর্ত্তের তরে মনে হইল, যাহারা সুন্দর, তাহারা নিজেদের পরিপূর্ণ রূপ কখনই দেখিতে পায় না।

আমি প্রশ্নের পর প্রশ্নে বালিকাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ীতে আর কে আছে?"

"বাড়ীতে ?" বলিয়া একটু থামিয়া রেবা বলিল, "আমার মা আছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বাবা কি করেন ?"

রেবা বিষণ্ণভাবে বলিল, "বাবা মারা গেছেন, অনেক দিন হ'ল।"

আমার মনে যে কৌতূহল জাগিতেছিল আমি তাহা তৃপ্ত করিতেই ব্যস্ত ছিলাম; কিন্তু সে কৌতূহলে নিষ্ঠুরতার পরিমাণ কতদূর ছিল, তাহা ভাবিবার অবসর হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে পড়েন বুঝি ?"

রেবা বলিল, "পড়্তাম, এখন আর পড়ি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

রেবা বলিল, "ইণ্টার ক্লাসে পড়তাম; পরীক্ষায় ফেল হয়ে ঘরে বসে আছি।"

আমি বলিলাম, "সে কি কথা ? আবার নিশ্চয়ই পরীক্ষা দেবেন।"

রেবা বলিল, "দেখা যাক, যদি তৈরি ক'রে উঠ্‌তে পারি।"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয় পারবেন।" তারপর বলিলাম, "আপনার ভাই বুঝি কলেজে পড়েন নি ?"

রেবা বলিল, "না, সে কাপাসের কারবার করচে।"

তারপর আমি রেবাকে পড়াশোনা করিতে খুব উৎসাহ দিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে সে বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না।

আমি হঠাৎ বলিলাম, "আপনাকে অবশ্যই মিস্ ফড়নীস্ বল্‌ব ?"

রেবা সলজ্জভাবে বলিল, "হ্যাঁ।" বলিতে বলিতে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে রেবা ভিতরে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে চা ও জলখাবার লইয়া আসিল।

আমি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া রেবা হাসিয়া সহজভাবে বলিল, "রোজ তো নিজেদেরই চা খান, একদিন না হয় পরদেশীর হাতেই খেলেন!"

সে-কথার সুরে মনে হইল, হয়ত তাহার বয়স বহুদিন পূর্ব্বেই কুড়ির কোঠা পার হইয়া গিয়াছে।

তারপর বাঙ্গলা দেশের কথা, রাজনীতির কথা, আরও কত কি কথা হইল। দেখিলাম, রেবা বড় বড় বাঙ্গালীদের সকলেরই নাম জানে এবং তাহাদের সগোত্র বলিয়া আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে।

আমি ভাবিলাম, কোথায় মহারাষ্ট্রের এই ব্রাহ্মণ-কন্যা, আর কোথায় এক ভবঘুরে বাঙ্গালী, যে দুনিয়ার ঢেউয়ে ঢেউয়ে বম্বেতে আসিয়া ঠেকিয়াছে! কিন্তু এ প্রভেদটা আমার মনে তত গভীরভাবে জাগে নাই, যত জাগিয়াছিল আর একটি কথা—সে অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী কেমন সরল সহজভাবে তাহার প্রাণের উচ্ছ্বাস আমার প্রতি ঢালিয়া দিতেছিল!

ফিরিবার পূর্ব্বে রেবাকে বলিলাম, "আপনার মার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন না?"

রেবা বলিল, "মা ভারী লাজুক। তাঁকে বল্‌ব, আপনি এসেছিলেন," বলিয়া একটু থামিয়া বলিল, "দামুর বন্ধু, বাঙ্গালী।" বলিয়া আবার আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া বিদায় দিল। বিদায়ের শেষ কথাটা—মারাঠীতে বলিয়াছিল—এখনও আমার কানে বাজে; "ইয়া," আসুন!

৫

তাহাকে যখন প্রথম দেখি, তখন যদি কেহ চৌপাটির উপর দাঁড়াইয়া বলিত, "দেখ, ঐ যে অপরূপ-সুন্দরী দক্ষিণী মেয়েটি দেখছ, সে দেড়মাস

পরে তোমাকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে,” তখন আমি ভাবিতাম, ইহা অপেক্ষা উদ্ভট কল্পনা আর হইতে পারে না। ইহা যদি উদ্ভট কল্পনা হয়, তবে তার পর যে দীর্ঘ তিন মাস কাটিয়াছে, তাহাকে কি বলা যায় ?

রেবাদের বাড়ীতে যাইবার দুইদিন পরে এক প্রভাতে দামোদর ফডনীস আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত ! সে যে সেদিন বাড়ীতে থাকিতে পারে নাই, তার জন্য কাতর দুঃখ প্রকাশ করিয়া কত কি যে বলিল, তাহা আমার পক্ষে বুঝিয়া উঠাও কঠিন হইল। তার কয়েকদিন পরে সে নিজে আসিয়া আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল এবং বেশ জাঁকালো রকমে চা'র বন্দোবস্ত করিল।

সেদিন সে রেবার পড়াশোনার কথ তুলিল। কি করিলে সে পরীক্ষা পাশ করিতে পারে, সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। আমি যে একজন বড়দরের বিদ্বান লোক এবং আমার সাহায্যে যে সহজেই এ-বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে, এ-সম্বন্ধে দামুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল, আমি যেন সর্ব্বদাই তাহাদের বাড়ী যাই, তাহাদিগকে আপনার লোক বলিয়া মনে করি।

রেবা পাশেই বসিয়াছিল। তাহার মুখের ভাবে বোঝা যাইতেছিল, সে সম্পূর্ণভাবে এ প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছে। আমি যখন উত্তর দিতে যাইব, তখন তাহার কোমল, মাধুর্য্যভরা দৃষ্টি আমার সহানুভূতি যাচ্ঞা করিতেছিল।

৬

ধীরে ধীরে খেতওয়াড়ীর সেই ছয়তলা বাড়ীর চতুর্থ তলার কোণের মহলটি বাস্তবিকই আমার অতি আপনার হইয়া গেল। সপ্তাহে দুই

তিন বার করিয়া সেখানে যাইতে লাগিলাম। প্রায়ই রেবা একা থাকিত।

কিছুদিনের মধ্যে রেবা আবিষ্কার করিল, আমি গান গাই। আমিও আবিষ্কার করিলাম, রেবা সঙ্গীতে অভিজ্ঞা। তারপর হইতে দুইটি তরুণ প্রাণের গীতিময় উচ্ছ্বাসে কৃষ্ণসদনের একটি প্রান্ত মুখরিত হইতে লাগিল। আমি রেবাকে আমার বাছা বাছা বাঙ্গলা গান শিখাইতে লাগিলাম।

কিন্তু আমি তাহাকে যাহা দিলাম, তাহার শতগুণ প্রতিদান পাইলাম। সেই সুন্দর তরুণ হৃদয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আমার ক্লিষ্ট, ম্লান চিত্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবনকে এত পবিত্র, এত সুন্দরভাবে দেখা যায়, এতদিন তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। ভাবিলাম, যদি আমার মধ্যে সত্য দৃঢ়তর হইয়া থাকে, পবিত্রতা শুভ্রতর হইয়া থাকে, বিশ্বের প্রতি মৈত্রী কিঞ্চিন্মাত্রও সজাগ হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই বিদেশিনী তরুণীর সুন্দর নির্ম্মল মুখখানি! রেবা যখন হারমোনিয়মে সুর তুলিত, আর সে-সুরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রঙিন ঠোঁট দুটি বিভক্ত হইয়া গানের রূপে একটা অন্তর্নিহিত অগ্নির উৎস বহাইয়া দিত, তখন আমি যে-বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, সে-বিস্ময় জগতের গূঢ়তম রহস্যভেদেও জন্মে কিনা সন্দেহ। সেতারের ঘাটে ঘাটে যখন তাহার কোমল চাঁপার মত আঙ্গুল খেলিয়া যাইত, তখন যেন কোন্ স্বপ্নলোকের প্রহেলিকা আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত।...

কিছুদিন পরে প্রত্যহই দুজনে একত্র বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। আজও আমার নিকট মালাবার পাহাড়ের শূন্যোদ্যান চঞ্চল-পরিহিতা নীলবসনা এক দক্ষিণী তরুণীর স্মৃতিতে জড়িত। আজও এপোলো বন্দরের কথা ভাবিলে জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায় নৌকায় দোলায়মানা একটি

সুন্দরী তরুণী সহচরীর কথা মনে পড়ে। আমার নিকট চৌপাটির প্রতি রেণু তাহার চরণ-চিহ্নে অঙ্কিত ; বম্বের ট্রামগুলো তাহার সংস্পর্শে মনোরম।...

ধীরে ধীরে আমাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িল।

একদিন তাহাকে বলিলাম, "দেখ, তোমার রেবা নামটার মারাঠী উচ্চারণ আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি এখন থেকে "রেউয়া" না ব'লে বাঙ্গলার মত ক'রে "রেবা" বল্‌ব।"

সে বলিল, "তা আর কেন ? আমার একটা ভাল দেখে বাঙ্গলা নামই রেখে দিন্ না। আপনাদের বাঙ্গলা নামগুলো কি সুন্দর !"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এখন আর নাম বদলিয়ে কি হবে ? বিয়ের সময় তো আবার বদ্‌লে যাবে।"

সে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। একটু থামিয়া বলিল, "আপনাদের দেশেও কি বিয়ের সময় নাম বদ্‌লায় ?"

আমি বলিলাম, "না।" তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "তবে এদেশে যদি কেউ বিয়ে করে তবে সে এ দাবী ছাড়বে কেন ?"

ইহার উত্তরে শুধু লজ্জায় তাহার মুখ রাঙিয়া উঠিল।

৭

সেদিনের সে-আলাপের পর হইতে আমার মনে একটা নূতন ভাবনা জাগিল। ভাবিলাম, "আমি এতকাল কি করিতেছি ? ঐ যে একটি কোমল তরুণ প্রাণে এত যত্ন করিয়া আসন পাতিতেছি, তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে ?" আমি আপন নেশার ভোরে দিনের পর দিন চলিতেছিলাম, তাহার কথা এদিক দিয়া মোটেই ভাবি নাই।

এখন দিনরাত্রি এ-কথাটা আমার মন তোলপাড় করিতে লাগিল। ভাবিলাম, বাড়ীতে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আশা করিয়া আছেন,

একদিন টাকার বোঝা লইয়া দেশে গিয়া বসিব ; তাঁহারা দশ-গাঁ দেখিয়া একটি টুক্‌টুকে মেয়ে আনিয়া বিবাহ দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু ধুমধাম করিয়া লইবেন। অন্ততঃ আমার কাকা তো সেই ধারণাই পোষণ করিতেন। কিন্তু আমি কি বাস্তবিক তাই চাই ?

নিজেকে কঠোর ভাবে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "যদি তাই হয়, তবে রেবার সঙ্গ ত্যাগ কর।"

তখন মন জেদ করিয়া বলিল, "সে যে আমার !"

আমি বলিলাম, "তুমি কে হে বাপু ? তুমি বাঙ্গালী, আর সে মহারাষ্ট্রী।"

মন বলিল, "আমি তাকে ভালবাসি ; সে আমায় ভালবাসে।"

আমি বলিলাম, "হ'লই বা, তা'তে কি এসে গেল ? সে ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র।"

মন বলিল, "এটা বম্বে সহর, ফরিদপুর জেলার আট-গাঁ নয়। এখানে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথায় সমাজ চলে না। এখানে সিভিল ল আছে, আর্য্য-সমাজ আছে।

আমি বলিলাম, "ভবিষ্যৎ ?"

মন বলিল, "যেখানে প্রেম, সেখানে ভবিষ্যৎ চিরোজ্জ্বল।"

ভবিষ্যতের কথায় ভাবিলাম, হয় ত বাঙ্গলার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িতে হইবে। তাহাতে মনটা একটু দমিয়া গেল। কেননা, রেঙ্গুন হউক, মেসোপোটেমিয়া হউক, আর ইজিপ্টই হউক, সর্ব্বত্রই একটা আশা লইয়া চলিয়াছি যে, শেষ পর্য্যন্ত একদিন না একদিন বাঙ্গলায় গিয়া পড়িতে পারিবই। বাঙ্গলার ভাষা, বাঙ্গলার আহার, বাঙ্গলার জল-বাতাস জীবনের শেষ দিনগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিবেই। তাই বাঙ্গলার সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হইবার কল্পনায় মনে একটু বে-সুর বাজিল।

কিন্তু নিজেকে বুঝাইলাম, "যদি বা বাঙ্গলার সমাজে গিয়া তাহাকে লইয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে না হয় এদেশেই রহিলাম। শুধু বাঙ্গলাই আমার দেশ, বম্বে আমার দেশ নয়?"

মনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "সারা ভারতবর্ষই আমার দেশ। তাহার প্রত্যেক ধূলিকণা আমার নিকট প্রিয়। তাহার প্রত্যেক নরনারী আমার আত্মীয়।"

সঙ্গে সঙ্গে মনের এক নীরব কোণে অবস্থিত সমালোচক বলিল, "ওহে ভণ্ড, ঢের দেশভক্তি দেখিয়েচ। বড় বড় কথায় কেন নিজেকে ঠকাতে চাও? সোজা কথায় বল, আমি নিজের ইচ্ছার পরিতৃপ্তি চাই।" তখন বলিলাম, "হ্যাঁ, আমি মুক্ত, আত্মনির্দ্দিষ্ট জীবন চাই। সমাজের বা ভূগোলের গণ্ডী আমায় বাঁধতে পারবে না।"

৮

তার একদিন পরে কৃষ্ণসদনে গিয়া বলিলাম, "রেবা, তোমার বাঙ্গলা নাম ঠিক করেচি, কবে নাম বদলানো যায় বল।"

রেবা বলিল, "তার মানে?" একটা অপ্রত্যাশিত উল্লাসে তাহার চক্ষু দুটি নাচিয়া উঠিয়াছিল।

আমি ধীরে ধীরে তাহার কাছে আমার ভালবাসা নিবেদন করিলাম। বলিলাম, তাহাকে ছাড়া আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

রেবা ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখ অসম্ভব রকম লাল হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ ছল ছল করিতেছিল।

আমি বলিলাম, "আমি বোধ হয় তোমার ভাবনার কারণ বুঝ্‌তে পেরেচি। আমি বাঙ্গালী, তুমি মহারাষ্ট্রী; আমি শূদ্র, তুমি ব্রাহ্মণ; তাই নয়?"

রেবা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তুমি প্রভু, আমি দাসী।" বলিতে বলিতে তাহার স্বর কম্পিত হইয়া উঠিল। সে অসীম আবেগে তাহার কোমল হাত দুটি বাড়াইয়া আমার পা ছুঁইল।

স্পর্শমাত্রে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার পায়ে প্রণাম! আমার মত লোক প্রণামের যোগ্য? আর সে-প্রণাম করিবে ঐ নির্ম্মল, সুন্দর, দেবকান্তি তরুণী? সে তাহার শুভ্র পবিত্র শিরে আমার পদধূলি লইয়া মাখিবে?

পায়েতে রেবার হস্তস্পর্শে আমার সমস্ত দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মনে হইল, আমি যেন কত বড় একটা প্রবঞ্চনা করিতে বসিয়াছি।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নীরব থাকিয়া বলিলাম, "এ কি রেবা?"

রেবা বিচলিত কণ্ঠে বলিল, "সত্যি তুমি আমায় ভালবাস?"

আমি অতি-আবেগের বোঝা নামাইবার চেষ্টায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়! তবে তোমার জাতের ভয় নেই, রেবা?"

রেবা আস্তে আস্তে বলিল, "না,—যদি তোমার না থাকে।"

আমি বলিলাম, "আমার আবার জাত! তা' কোনও দিন ছিলও না, থাক্‌বেও না।"

রেবা সতৃষ্ণভাবে আমার কথা শুনিতেছিল। আমি সহজ, স্ফূর্ত্তিপূর্ণ স্বরে বলিলাম, "বেশ, তা'হ'লে আমাদের বিবাহে কোন বাধা নেই।"

রেবা বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "তোমার মার অবশ্য মত নিতে হবে।"

হঠাৎ রেবার মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গেল। ঠোঁটদুটি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, “কি ? মা মত দেবেন না ?”

রেবা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, “তা দেবেন বই কি ।”

“তবে ?”

রেবা নীরব ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার মা কবে আস্‌বেন ?” আমার প্রথম আসার কিছুদিন পরেই তাহার মা বন্ধের বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া সে বলিয়াছিল ।

রেবা চেষ্টা করিয়া শক্ত হইয়া বলিল, “তা’ তো এখনও বল্‌তে পারি না ।”

“তিনি তোমার দিদির বাড়ী গেছেন, না ? তুমি তো তাই বলেছিলে ।”

রেবা ধীর কণ্ঠে বলিল, “হ্যাঁ ।”

“সে তো বহুদিন হয়ে গেচে ।”

“তিনি ও-রকম থাকেন ।” কিঞ্চিৎ থামিয়া বলিল, “দিদির অসুখ করেছিল ।”

“তোমাকে একা ফেলে তিনি এতদিন রয়ে গেলেন ? সে কেমন ?”

সে একটু থামিয়া বলিল, “পূর্ব্বে আমাকে নিয়েই যেতেন। এবার—”-বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “আমি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি বলে, আমায় নিয়ে যান নি। আমি তো আর কচি খুকী নই যে আমার জন্যে ভাবনা কর্‌বেন !”

আমি হাসিলাম। সেও মৃদু হাসিল।

আমি বলিলাম, “তা মোটেই নয় ! আচ্ছা তাঁকে শিগ্‌গির আস্‌তে লেখ ।”

সে শান্তভাবে বলিল, “লিখ্‌ব ।”

আমি বলিলাম, "রেবা, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তো আর তোমার বোনের বাড়ী যেতে পারবে না ?"

সে একটু কৌতূহলের সহিত বলিল, "কেন ?"

"তুমি যে অন্যজাতীয় হ'য়ে পড়বে, তারা তোমাকে সমাজে নেবে কেন ?"

সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "নাই বা নিল !"

বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমি হঠাৎ বলিলাম, "রেবা, তোমার ভাইয়ের মত নিতে হবে না ?"

কথাটা বলিয়া আমি হাসিলাম, সেও ঈষৎ হাসিল। তার কারণ এই যে, ভাইটির দেহ যেমন, বুদ্ধিটিও তেমন মোটা। এতদিনের মধ্যে দামোদরের সঙ্গে দুচারটা খাপছাড়া কথা ছাড়া বিশেষ আলাপ হয় নাই।

রেবা বলিল, "তার আবার মত কি ?"

নীচে রাস্তায় নামিয়া আসিয়া অভ্যাসমত ফিরিয়া উপরের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, চারতলার রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া রেবা যেন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে আমার গতি অনুসরণ করিতেছে।

রাস্তার পরপারে গিয়া আবার তাকাইলাম। তাকাইতেই সে হাতছানি দিয়া উপরে যাইতে ইসারা করিল। ফিরিয়া চার ধাপ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম।

উঠিয়া দেখিলাম, রেবা বারান্দায় নাই। ঘরের সামনে যাইতেই দেখিলাম, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। ইহাতে অবাক্ হইয়া গেলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভাবিলাম, হয়ত তেতলা হইতে অপর কেহ আর কাহাকেও ডাকিতেছিল, আমি দূর হইতে ভুল করিয়াছি।

দরজার কাছে গিয়া ডাকিলাম, "রেবা !"

উত্তর নাই। সে সাম্‌নের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে গিয়াছে ভাবিয়া ফিরিয়া চলিলাম। প্রথম ধাপ সিঁড়ি প্রায় নামিয়া শেষ করিয়াছি, এমন সময়ে পেছনে মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিতীয় ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপের শেষভাগে আসিয়াও পশ্চাতে মৃদু পদশব্দ শুনিলাম। আমি থামিতেই তাহা থামিয়া গেল। তৃতীয় ধাপের কয়েক সিঁড়ি গিয়া থামিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, উপরের সিঁড়ি হইতে রেবা নামিয়া আসিতেছে।

আমি অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি রেবা ?"

তাহার মুখ আরক্ত। সে বলিল, "ঘরে এসো।"

দুজনে ঘরে গিয়া উঠিলাম। রেবা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি যদি কোনও দোষ ক'রে থাকি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে ?"

আমি বলিলাম, "তোমার আবার কি দোষ ? বলই না।"

সে বলিল, "ক্ষমা করবে কিনা বল।"

আমি বলিলাম, "কেন ক্ষমা করব না, রেবা ? আমি যে তোমায় ভালবাসি !"

ইহাতে হঠাৎ রেবার চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল আসিয়া তাহার আরক্ত গাল দুটি বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, "একি ?"

রেবা মাটিতে জানু পাতিয়া, তাহার মাথাটি আমার কোলের উপর রাখিয়া দুইহাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি তুমি আমায় ভালবাস ?"

আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সঙ্গে এত কালের পরিচয়, কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ ব্যবহার এ পর্য্যন্ত সে কোনও দিন

করে নাই। প্রথম প্রথম বই পেন্সিল হাতে-হাতে না দিয়া সামনে টেবিলের উপর রাখিত এবং একত্র চলা-ফেরা করিলেও উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা একটা সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব থাকিত। যদিও কালক্রমে সে দূরত্ব চলিয়া যায়, তথাপি আজিকার এই নিঃসঙ্কোচ আত্মসমর্পণে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

আমি বলিলাম, "রেবা, বল তোমার কি হয়েছে।"

রেবার অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমায় চির-কাল ভালবাস্‌বে?"

আমি বলিলাম, "বাস্‌ব, চিরকাল তোমায় ভালবাস্‌বো, রেবা।"

রেবার অশ্রু থামিল। ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমিই আমায় ডেকেছিলে, রেবা?"

সে বলিল, "হাঁ্যা।"

"ডেকে দরজা বন্ধ কর্‌লে কেন?"

রেবা ভীরুকণ্ঠে বলিল, "ভাব্‌লাম, থাক্‌, তোমাকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই?"

"উপরে ডেকে এনে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই?"

"সে কথা মনে করেই তো আবার তোমার পেছু পেছু গেলাম।"

"আমিতোমায় চিরকাল ভালবাসবো কিনা, একথা জিজ্ঞাসা করতেই ডেকেছিলে?"

রেবা স্থিরনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ্যা।"

তাহার কপালে মুখে আমার ভালবাসার নিদর্শন রাখিয়া আমি বিদায় লইলাম। ভাবিলাম, "বাস্তবিকই আমি কি এই সুন্দর প্রাণটির উপযুক্ত?"

৯

তারপর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিনের পর দিন অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম রেবার মায়ের আসার কতদূর। প্রথম কয়েকদিন চিঠির জবাবই আসিল না। তারপর একদিন রেবা বলিল, জবাব আসিয়াছে ; মা এখন আসিতে পারিবেন না, দিদির অসুখ সারে নাই। বিশেষ বিমর্ষভাবে সে খবরটা দিল।

আমি বলিলাম, "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ?"

রেবা বলিল, "তুমি যা বল।"

আমি বলিলাম, "আমি তো এখনও তোমার ভাইকে কিছুই বলিনি, কেননা তোমার মায়ের মত না পেলে এ বিষয়ে আলোচনা করে কি লাভ ?" রেবা খুব বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইল। ক্ষণেক পরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "কেন, মার মত না নিলে হয় না ?"

আমি বলিলাম, "তোমার মার মতের অপেক্ষা না ক'রে তোমার বিয়ে হবে ?"

রেবা বলিল, "হ'লে দোষ কি ?"

আমি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এতদিন যে খাঁটি ভারতীয় লজ্জা সঙ্কোচ দ্বারা নিজেকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, আজ কিনা সে বিলাতী "ইলোপমেণ্টের" সহায়তা চায় !

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "দোষ আছে বৈকি ? তোমার মাকে আস্‌তে দাও। তিনি যখন জীবিত আছেন, তখন তাঁর মত না নিলে চল্‌বে কেন ? আর তুমি নিজেই বলেচ যে, তাঁর অমত হবে না !"

রেবা বলিল, "যদি হয় ?"

আমি বলিলাম, "প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি মত না দেন, তখন পরে যা ভাল মনে করি কর্‌ব।"

রেবা হঠাৎ জেদের সুরে বলিল, "তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না, তাই মায়ের মতের অজুহাত খুঁজছ।"

আমি তাহার এই আকস্মিক রূঢ়তায় অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম, "রেবা, তুমি কেমন করে একথা বলতে পার ?"

রেবা বলিল, "তা না হ'লে তুমি রোজ রোজ মায়ের মতের কথা বল কেন ?"

আমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "যদি মায়ের মত ছাড়া বিয়ে কর্তে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমি কেন তার জন্যে অস্থির হব ? তবে কর্ত্তব্যও ত আছে ?"

রেবা হতাশ হইয়া বলিল, "তা হ'লে আমাদের বিয়ে কবে হবে কে জানে ?"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কাল তোমার ভাইয়ের মত নিয়েই অগ্রসর হব।"

রেবা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "না, তার দরকার নেই। তার মত জিজ্ঞাসা ক'রো না।"

কথায় এত অতিরিক্ত দৃঢ়তা দেখিয়া বুঝিলাম, বোনের নিকট ভাইটির মূল্য অতি কম।

পরদিন তাহাকে মিউজিয়ামে লইয়া যাইবার কথা। বেলা দুইটাতে আফিস ত্যাগ করিলাম। ট্রাম হইতে নামিবার পূর্ব্বে দেখিলাম, দামোদর অপর দিকের ট্রামে উঠিয়া বসিয়াছে। আমার দিকে চাহিল, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন অপ্রসন্ন।

দামুর সঙ্গে দেখা খুবই কম হয়। সে সকালে কাজে যায়, দুপুরে ঘরে আসে, কিছু সময় থাকিয়া আবার চলিয়া যায়, সন্ধ্যায় ফিরে। আজিকার এই ক্ষণেকের দৃষ্টি-বিনিময়ে আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা

বাধিল। ভাবিলাম, দামু কি তাহার গৃহে আমার আনাগোনা অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেছে? ভাবিলাম, সে যদি একদিন বলে, "বাবুসাহেব, তুমি আমার বাড়ী আর এস না।"...যদি একদিন অভিভাবকের মত কঠোর আদেশ করে, "রেবা, তুই আর বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌বি নে!"

দামু অভিভাবকের মঞ্চে আসীন, রেবা তাহার অনুগতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, একথাটা ভাবিতেই হাসি পাইল!

কৃষ্ণসদনে গিয়া দেখিলাম, রেবা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমি যাইতেই দাঁড়াইয়া বলিল, "চল"। উভয়ে বাহির হইলাম।

ট্রামে যখন রেবা আমার পাশে বসিয়াছিল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহাতে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নাই, আনন্দ নাই, কি যেন একটা চিন্তায় সে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মিউজিয়ামের সব জিনিষ একে একে তাহাকে দেখাইতে লাগিলাম। মনোরম প্রস্তরমূর্ত্তি, বড় বড় তৈলচিত্র, কাঠের নানা রকম কাজ, ঐতিহাসিক স্মৃতি—আরও কত কিছু। এক ঘরের দেয়ালে দেখাইলাম, একশত বছর আগেকার বম্বের চিত্র। এখন সেখানে বিপুল অট্টালিকার সারি, যেখানে তখন ছিল শুধু সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, তাহার উপর চাষারা মেষ চরাইতেছে। আর এক স্থানে দেখাইলাম, একদল মাটির মানুষ। প্রত্যেকে ভারতের এক এক জাতির চেহারা ও পোষাকের পরিচয় দিতেছে। আরও কত কিছু দেখাইলাম। কিন্তু কোনটাই রেবার চিত্ত আকর্ষণ করিল না। সে শুধু মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিতেছিল, এবং চোখে চোখে দৃষ্টি পড়িলেই চোখ ফিরাইয়া লইতেছিল।

অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর বাহিরের বাগানে আসিলাম। মিউজিয়ামের এক পাশে গিয়া পাথরের উপর দুজনে বসিলাম। রেবা গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমাকে একটি কথা বলতে চাই।"

আমি বলিলাম, "বল না!" বলিয়াই হাসিয়া বলিলাম, "ব্রোচ্‌টা তোমার পছন্দ হয়নি বুঝি?" সেদিন সকালে তাহাকে একটি পাথর-বসান ব্রোচ উপহার দিয়াছিলাম, এবং সে তাহা পরিয়াই আসিয়াছিল।

রেবা আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, সে কথা নয়। তুমি বলেচ আমায় চিরকাল ভালবাসবে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সে কথা আবার কেন?"

"আমার সব দোষ ক্ষমা করবে?—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "তা ত বলেইচি।"

"আমি যদি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলে থাকি?"

"কি মিথ্যা কথা বলেছ?"

"ক্ষমা করবে কি না আগে বল।"

আমি বলিলাম, "করব।"

সে বলিল, "সত্য কর।"

আমি একটু অবাক্ হইয়া বলিলাম, "কেন?"

সে মৃদুভাবে বলিল, "করই না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা করলাম।"

রেবা গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার মা নেই।"

আমি নেহাৎ সহজভাবে বলিলাম, "তার মানে?"

রেবা বলিল, "আমার বাবার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই মা মারা যান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে যে তুমি বল্‌লে?

রেবা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, তাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি মিছে কথা বল্‌চ!"

রেবা ধীরভাবে বলিল, "না।"

"সে কি কথা?" বলিয়া আমি বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম।

রেবা বলিল, "তুমি হয়ত ভাব্‌বে, মা ছাড়া, অভিভাবক ছাড়া মেয়ে হয়ত ভাল হবে না, হয়ত তা ভেবে আমায় ভালবাস্‌তে না, তাই আমি মায়ের কথা বলেচি।"

"তবে তোমার মা দিদির বাড়ী যান নি?'

"না।"

"তোমার দিদি?"

"আমার দিদিও নেই। আমি তোমায় মিছে কথা বলেচি।" বলিতে বলিতে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

আমি বিস্ময় রাখিতে পারিলাম না। তাহার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া বলিলাম, "মাও নেই, দিদিও নেই, সব মিথ্যা? চিঠি লেখার কথা মিথ্যা? আমি এতদিন যে চিঠির অপেক্ষা করে ছিলাম, তার মূলে সব ঝুটা?"

রেবা ধীর, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "হ্যাঁ"।

আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ট্রাম ধরিলাম। সেদিন ট্রাম হইতে নামিয়া তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম, উপরে উঠিলাম না। রেবা উপরে যাইবার সময় শুধু রাখিয়া গেল, তাহার সেই সুন্দর দৃষ্টিটি—কিন্তু আজ অসীম ব্যথা-ভরা, কাতরতা-মাখা। পূর্ব্বদিনের প্রণামে সে আমার কাছে নিজেকে যত

না দীন করিয়া তুলিয়াছিল, আজিকার এ দৃষ্টিতে যেন তার চেয়ে আরও অনেক বেশী করিয়া দিল।

১০

সে রাত, পরদিন, তার পরের রাত,—মোট প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ধরিয়া আমি শুধু তাহার কথা ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যাহাকে আমি ভালবাসিয়াছি, যাহাকে নিজের জীবন-সঙ্গিনী করিতে যাইতেছি, সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী! কথাটাকে আশৈশব কেমন আন্তরিকভাবে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। মিথ্যা বলা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদিগকে তো কোনও দিন আমার সঙ্গে মিশিতে দিই নাই।

রেবা মিথ্যাবাদী,—দিনের পর দিন এত বড় একটা মিথ্যা কথা দিয়া আমাকে ভাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন এক মিথ্যায় বহু মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া প্রবঞ্চিত করিয়াছে, একথা ভাবিতে ভাবিতে আমার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, "এই শেষ।"

ছুইদিন খেতওয়াড়ীর বাড়ীতে গেলাম না।

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুমের শেষ সময়টাতে যেন আধ-স্বপ্ন আধ-জাগরণে কে বলিয়া গেল, "তুমি মানব-চরিত্রের কি জান?"

ভাবিলাম, আমি মানব-চরিত্রের কি জানি? যে তরুণী তাহার প্রাণ দিয়া আমায় ভালবাসিয়াছে, একান্তভাবে নিজেকে আমার কাছে লুটাইয়া দিয়াছে, সে ক্ষণেকের ভুলে একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছে বলিয়াই তাহার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত মনুষ্যত্ব পণ্ড হইয়া গেল?

নিজেকে নিজে বলিলাম, "জগতে শুধু 'পিউরিটান'' (puritan)ই বাস করে না, আরও অনেকের এতে স্থান আছে। আমার ছুকথা নীতির বলেই জগৎ চল্‌বে, এ মনে করা ধৃষ্টতা।"

মনে পড়িল রেবার শেষ চাহনিটি। ভাবিলাম, যদি সামান্য এ ত্রুটিটুকু ক্ষমা করিতে না পারি, তবে কোন্ গুণে অমন একটি তরুণ প্রাণের একনিষ্ঠ ভালবাসা লাভের উপযুক্ত হইব? সে মিথ্যা বলিয়াছিল আমার ভালবাসা যাহাতে না হারায় সেই জন্যে, অন্য কোনো স্বার্থ-সাধনের জন্য ত নয়!

মন তেজের সহিত বলিল, "আমি জীবনকে চাই, নীতি চাই না। নীতি আমার জীবনের বেগ রুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে না।"

১১

সেদিন অপরাহ্নে কৃষ্ণসদনে গেলাম। সন্তর্পণে—জানি না কেন—সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। ধীরে ধীরে দামোদরের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা খুলিতেই দেখিলাম, রেবা পাশের ঘরে বসিয়া। পর্দ্দা সরানো ছিল, তাই ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে দেখিলাম। তাহার চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার সম্মুখে একখানা অবাঁধানো ফটোগ্রাফ; কাছে গিয়া দেখিলাম, তাহা তাহার ও আমার একত্রে তোলা একখানা ছবি। রেবা নিবিষ্টভাবে তাহা দেখিতেছিল।

আমার দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বলিল, "আমায় ক্ষমা করেচ? নিশ্চয়! তোমার মুখেই তা প্রকাশ পাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "করেচি।"

রেবা মুখ তুলিয়া, ওষ্ঠাধরের নীরব ভাষায়, প্রাণের আবেগ ব্যক্ত করিল।

আমি বলিলাম, "বেশ, তোমার মা নেই, এক গোলমাল চুকে গেল। এখন তোমার ভাই আর তুমি দুজনেই কর্ত্তা। বড় বোনের ঝঞ্ঝাটও নেই। কেমন, না?"

রেবা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "তবে ভাইয়ের সঙ্গেই সব ঠিক করা যা'ক, কেমন?"

রেবা বলিল, "সে ঠিক করবে কি! তুমি যা বল্‌বে, তাই হ'বে।"

আজ রেবাদের ঘরে বসিয়া একটা নূতন রকমের অনুভূতি জাগিল। এতকাল যখনই এ ঘরে আসিয়াছি, তখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে মনে হইয়াছে, রেবা, তার মা, তার ভাই। সচেতন ভাবে না হইলেও, মনের অচেতন বা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সে কথাটা প্রচ্ছন্ন ছিল। আজ সে স্থান হইতে মায়ের সত্তাটি উঠিয়া গিয়াছে। তাই এ ঘর, এ টেবিল, এ আয়না, এ সবের সঙ্গে যেন মনের কেমন একটা অপরিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বুঝিলাম, রেবার মা নাই, বোন নাই, এ ধারণাটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহাকে শুধু মনের অন্য ধারণাগুলির সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে হইবে তা নয়, তাহার সহিত জড়িত সমস্ত বস্তুসমূহের সঙ্গেও নূতন করিয়া সম্বন্ধ পাতিতে হইবে।

রেবাকে বলিলাম, "রেবা, চল, বেড়াতে যাবে?"

সে বলিল, "কোথায়?'

আমি বলিলাম, "যেখানে খুসী, তবে মিউজিয়ামে নয়, সে জায়গাটা আমার বড় অপ্রিয় হয়ে গেচে।"

রেবা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বলিল, "তবে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে।"

আমি বলিলাম, "তাতেও তো মিউজিয়াম আছে।"

রেবা বলিল, "হলেও তো তা ভিন্ন।"

উভয়ে ট্রামে চড়িয়া ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে গেলাম। সেখানকার মিউজিয়াম-ঘরে ঢুকিতে যাইব, এমন সময় দেখিলাম, একজন বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক ছেলেপিলে লইয়া ভিতর হইতে দেখিতে দেখিতে বাহিরে আসিতেছেন।

তখন জানি না, কি একটা সহজ প্রেরণার বশে মিউজিয়ামে না ঢুকিয়া রেবাকে বলিলাম, "চল, বাইরে যাই।" তারপর তাহাকে বাগানের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়া আমি পিছনে রহিলাম। বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলে তাহার সঙ্গে গিয়া মিশিলাম।

বম্বে সহরে না আছে, পৃথিবীর এমন কোনও সভ্য জাতি নাই। কিন্তু আমি ভাবিয়া পাই না, অন্য জাতির সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে চলিতে পারি, বয়স্ক বাঙ্গালী দেখিলে কেন তেমন পারি না।

কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর রেবা ক্লান্তভাবে এক বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। আমাকে কাছে বসাইয়া বলিল, "আজ আবার মিউজিয়ামে কেন এসেচি জান?"

আমি বলিলাম, "কেন?"

রেবা বলিল, "সেদিনকার মত অপ্রিয় কথা তুল্‌ব বলে'।"

আমি বলিলাম, "সে আবার কি?"

রেবা বলিল, "সেদিন তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলে যে, আমি সব কথা বল্‌বার সাহস পাই নি।"

আমি চকিত হইয়া বলিলাম, "আরও বল্‌বার কিছু ছিল নাকি?"

রেবা শান্তকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ।"

আমি বলিলাম, "কি বল।"

রেবা বলিল, "তুমি উত্তেজিত হবে না?" সে স্বরে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় মিনতি মাখা ছিল। ঘাতকের উদ্যত হস্ত হইতে প্রাণরক্ষার জন্য যেমন করিয়া মিনতি করে, ঠিক সেই রকম।

কণ্ঠে একটা গভীর অসহায় ভাব লইয়া রেবা বলিল, "তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না বল।"

আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইলাম। রেবার চক্ষুদুটি জলভারাক্রান্ত হইল, কিন্তু জল আসিল না। সে বলিল, "বল্‌ব ?"

আমি বলিলাম, "বল।"

রেবা ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আমি বিধবা।"

আমি বিপুল চেষ্টায় নিজের আবেগ চাপিয়া বলিলাম, "রেবা !"

জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড ধরিতে অগ্রসর হয়, রেবা তেমনিভাবে আমার হাতের কাছে হাত আনিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসা পাবার জন্য আমি সব গোপন করেছি। যে মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি দেখি, সে মুহূর্ত্ত হ'তে আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সে মুহূর্ত্তে তোমার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেচি।"

আমি ক্ষণকালের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাহার কপালের সিঁদুরের টিপটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। রেবা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি যদি আমার ভালবাসা গ্রহণ করলে, তবে আমাকে তোমার পায়ে স্থান দেবে না ?"

রেবার দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত উত্তেজনা নিবিয়া গেল। তাহার সে করুণ ব্যথাভরা কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল থামিয়া আমি বলিলাম, "রেবা, আমায় একটু একেলা ভাবতে দেবে ?"

রেবা নীরবে আমার সঙ্গে উঠিল, এবং বাগান ছাড়িয়া চলিল।

উভয়ে ট্রামে উঠিলাম। রেবার বাড়ীর রাস্তায় তাহাকে দিয়া বলিলাম, "এখন আসি।"

রেবা চক্ষু তুলিয়া চাহিল না। কি একটা দুর্ব্বহ বোঝায় যেন তাহার মাথা ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল।

১২

আমি বাড়ী না গিয়া সমুদ্র-তীরে গেলাম এবং প্রায় সারা রাত্রি সেখানেই কাটাইলাম। রেবার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি কথা, আমার মনে একবার, দু'বার, শতবার আনা-গোনা করিতে লাগিল। সমস্ত স্মৃতির শেষে প্রতিবারই ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, অর্গলবদ্ধ কপাট-জোড়ার মত সেই কঠিন কর্কশ দুটি কথা,—"আমি বিধবা।"

বিধবা বলিলেই চিরকাল মনে হইয়াছে একটা নিষ্ফল নিঃসার জীবন—যাহার শেষ কথা শেষ হইয়া গিয়াছে; যাহার এ পৃথিবীতে আর কিছু কাম্য, কিছু প্রাপ্য নাই। আজ আমার প্রেমপাত্রী বিধবা,—বিধবাকে আজ আমি বিবাহ করিতে উদ্যত,—কথাটা একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চিত্ত দগ্ধ করিতে লাগিল।

পরদিন যথারীতি স্নানাহার করিয়া আফিসে গেলাম, কিন্তু চিত্ত-বিক্ষোভ কমিল না, বরং বাড়িয়াই চলিল। আফিসের সহকর্ম্মীদের কথাবার্ত্তা, সাহেব কেরাণী সিপাহীদের আলাপ, রাস্তার লোকের কোলাহল, সমস্তের মধ্য দিয়া এক একবার যেন এক করুণ মর্ম্মভেদী কণ্ঠ বলিয়া উঠিতেছিল, "আমি বিধবা!" মস্তিষ্কের ভিতর, রক্তের স্পন্দনে স্পন্দনে, বার বার খেলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি বিধবা!" লোকের পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়িয়া একটা তীব্র আর্ত্তনাদ বাহির হইতেছিল—"আমি বিধবা! আমি বিধবা!"

চিত্ত তিক্তভাবে স্বীকার করিল, রেবা বিধবা। সে মিস্ ফড়নীস্ নয়, মিসেস্ কেহ। 'রেবা' তার নিজ নাম নয়, তার স্বামীর ঘরের দেওয়া নাম।

অপরাহ্নের ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিবিড় নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। আফিস ছাড়িয়া ট্রামে না গিয়া জনস্রোতে গা

ভাসাইয়া দিলাম। নিজের শূন্যতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যেন মন ঐ বিপুল জনতার আশ্রয় লইতে চাহিল। যেখানে সকলেই সচল, যেখানে কর্ম্মের উল্লাস, সেখানে যেন প্রাণের ব্যথা-বেদনা আপনা হইতেই নীরব হইয়া যায়। অন্ততঃ এই আশাতেই জনতার সঙ্গে ফোর্টের রাস্তা ছাড়িয়া সাগর-তীরে গেলাম। দুইদিকে খেলার সবুজ মাঠ রাখিয়া রেল লাইন পার হইয়া ষ্টেশনের কাছে গিয়া পড়িলাম।

ষ্টেশন ঘরের দেওয়ালে শাদা মোটা মোটা অক্ষরে লেখা "চার্চ্চগেট" শব্দগুলি যেন যাত্রীদেরে আহ্বান করিতেছিল। হঠাৎ ভাবিলাম, কাল রাত্রের অনিদ্রা, তারপর আজিকার চিন্তা, এ-সবের পরে একবার শহরের বাহিরের হাওয়াতে গিয়া বেড়াইলে মন্দ হয় না। এ কথা মনে হইতেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিলাম—স্যাণ্টাক্রুজের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ীতে উঠিলাম, এবং দেখিতে দেখিতে শহরের অট্টালিকা ও মানুষের ভিড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

অপরাহ্ণের লোকাল ট্রেনে দিনের কর্ম্মশেষে লোকেরা যে যার ঘরে ফিরিতেছিল। কামরা বোঝাই। আমি একান্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ বসিতে বসিতে তন্দ্রা আসিল, বোধ হয় পূর্ব্ব রাত্রের জাগরণের দরুণ। কানের ভিতর গাড়ীর ঝকা-ঝক্-ঝক্ শব্দ ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। এক একবার তাহা উঁচু হইয়া ওঠে, আবার নামিয়া পড়ে। হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরে মনে হইল, কে যেন এ যন্ত্র-নির্ঘোষের সঙ্গে এক বিরাট্ ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া বলিতেছে, "বিধবা! বিধবা! মিস্ নয়, মিসেস্!"

বাণাহতের মত মাথা তুলিয়া বসিলাম। একটা তীব্র যাতনা বৃশ্চিকের মত চিত্ত দংশন করিতে লাগিল।

স্যাণ্টাক্রুজ ষ্টেশনে নামিয়া সোজা জুহুর দিকে চলিলাম। তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। দূরে দেখা যাইতেছিল জুহুর ঘন নারিকেল বন আকাশে একটা গাঢ় কাল আবরণ রচনা করিতেছে।

আমি ধীরপদে নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া চলিতেছিলাম। কিন্তু কি চিন্তা করিতেছি, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। শুধু মনের উপর এই একটা ধারণা পাষাণের মত চাপিয়া ছিল যে, আমার সম্মুখে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কোনও সমাধান নাই।

তখন জুহুর উপকূল প্রায় জনশূন্য; শুধু একপাশে একটা তাঁবুতে দু'চারজন সাহেব-মেম বনভোজন করিতেছিল। আমি একটা নারিকেল গাছের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে সাগর-সৈকতে গিয়া নামিলাম এবং শুভ্র বালুরাশির উপর আসন পাতিয়া বসিলাম। সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমাকাশে তখনও তাহার শেষ আভা মুমূর্ষুর হাসির মত খেলা করিতেছিল। সৈকতের পাশ দিয়া একটা গাঢ় কৃষ্ণ রেখা বাঁকা হইয়া সমুদ্রের তীর নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল। উত্তর দিকে সে রেখা গিয়া একটা ক্ষীণ অন্তরীপে পরিণত হইয়াছে, এবং দক্ষিণে এক অনির্দ্দিষ্ট শিলাস্তূপে মিশিয়া গিয়াছে।

একটা গভীর শান্তির শীতল স্পর্শে আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। আমি নীরব নিশ্চলভাবে সেখানে বহুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কোনও সমস্যার কথা ভাবিলাম না। শুধু বিরাট্ প্রকৃতির নীরব বক্ষে নিজেকে লুটাইয়া দিলাম। তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শ সারা অঙ্গে মাখিয়া লইলাম।

সমুদ্রের ঢেউ লুফিয়া লুফিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। শাদা শাদা ফেনাগুলি বালির উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তারপর ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র লবণপুঞ্জে পরিণত হইতেছিল। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, শুধু জলরাশি —দূরে কুজ্ঝটিকার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। দক্ষিণে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী

কালো ছায়ায় মিলাইয়া পড়িতেছে। বামে দূরে অস্পষ্ট দীপমালা এক অজানা মায়াপুরী রচনা করিয়াছে।

সেদিনকার সে কয়টি মুহূর্ত্ত আমার কাছে অনন্ত মুহূর্ত্ত। আমি আত্ম-বিস্মৃত হইলাম। যেন আমি এক গৃহহারা বাঙ্গালী নই, যে নিজের দুরন্ত অক্ষমতা লইয়া সারা দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার ভালবাসা, আমার ব্যথা, সমস্ত লোপ পাইল। শুধু মনে হইল, আমি অসীম প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, সমুদ্রের সৈকতের উপর একটি বালুকণা, সমুদ্রতীরের একটি তৃণ-গুচ্ছ।

শীতল বাতাসে চক্ষু ঘুমে জড় হইয়া আসিল। তাই উঠিয়া ফিরিয়া চলিলাম। পথে দেখিলাম, সাহেব-মেমদের মোটর প্রস্তুত, খানসামা দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াই হউক, কিংবা স্বাভাবিক কারণেই হউক, আমার মনে আবার পূর্ব্ব চিন্তা জাগিল। ভাবিলাম, জগৎ কত সুন্দর, কত সুখময় হইত, যদি রেবা বিধবা না হইত।

পিছন হইতে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত সাহেব-মেমদের দল চলিয়া গেল।

তখন মনের সহিত পুনরায় যুক্তি করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে মনে বলিলাম, যদি সারা ইউরোপ, আমেরিকা, এমন কি এসিয়ার সমস্ত অহিন্দু জাতি বিধবা বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে, শান্ত পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, তবে আমাদের শুধু একটি দেশের এক সমাজের লোকের সে বিষয়ে এত আপত্তি হইবে কেন?

ষ্টেশনে আসিলাম। সিগন্যালের লাল আলো সবুজ হইল। হুহু করিয়া বম্বের গাড়ী আসিল। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিলাম, এ আমাদের সমাজের সঙ্কীর্ণতা বৈ আর কিছু নয়।

হঠাৎ যেন একটা নূতন সত্যের আলোকে মন ঝলসিয়া উঠিল। প্রাণে একটা নূতন উচ্ছ্বাস জাগিল। সে উচ্ছ্বাস হৃদয়ে বহন করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সেদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে কে যেন মনের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "জীবন দুর্জ্জয়, দুর্ব্বার! মূর্খ, তাকে সমাজের গণ্ডী দিয়ে বাঁধতে চাও?"

১৩

পরদিন প্রভাতে যখন উঠিলাম, তখন মনের মধ্যে সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছে। সেদিন আফিসে অসুখের নোট পাঠাইয়া বেলা এগারোটাতে খেতওয়াড়ী গেলাম। কৃষ্ণসদনে উঠিয়া দেখিলাম, রেবা ও দামোদরে কারওয়ারী ভাষায় তীব্র তর্ক চলিতেছে, এবং রেবার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। আমি দরজায় দাঁড়াইতেই রেবার স্বর বদ্‌লাইয়া গেল, যেন পূর্ব্বের তর্ক রাখিয়া নূতন বিষয়ে দামুকে দৃঢ়তার সহিত কি বলিল। আমি তাহাদের কথার একবর্ণও বুঝি নাই, শুধু স্বরের নূতন ভঙ্গী দেখিয়া একথা মনে হইল।

দামোদর চুপ করিয়া ভিতরের ঘরে গেল এবং একটা ষ্টোভ জ্বালাইতে ব্যাপৃত হইল।

রেবা আমার কাছে আসিয়া বিশেষ ত্রস্তভাবে বলিল, "আজ যে এ সময়ে?" তাহার চুল আলুথালু, চোখ কতকটা কোটরগত, চোখের পাতা ঈষৎ স্ফীত। হয়ত, আমার মত সেও অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইয়াছে। হয়ত কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে।...

আমি বলিলাম, "আজ শরীরটা ভাল নেই, আফিসে যাই নি।"

রেবার ত্রস্তভাব দূর হইল না। মনে হইল, যেন এ সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সে অনিচ্ছুক। সেদিনকার কথার পর আমার

মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

তথাপি আমি বলিলাম, "রেবা, আমি তোমাকে সেদিনকার বিষয়ে আমার মত জানাতে এসেচি।"

রেবা তাড়াতাড়ি বলিল, "এখন না বললে হয় না ? বিকেলে ?"

আমি বলিলাম, "এখন তোমার ভাইও উপস্থিত আছে, সব বিষয়েই মীমাংসা করা যাবে।"

গভীর বিরক্তির সহিত রেবা বলিল, "তার সঙ্গে কি ?"

আমি বলিলাম, "আপত্তি কি ? সে তো তোমার ভাই ?"

দামু দরজার ওপাশ হইতে কথা শুনিতেছিল। আমার একথার পর হঠাৎ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। এতকাল যখনই তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তখনই লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মুখের স্থূল মাংসপেশীগুলি স্থির, শান্ত ; যেন সংসারের একটা সহজ সাধাসিধে তৃপ্তিতে ভরা ; তাহাতে চিন্তা বা ক্লান্তির কোনও চিহ্ন নাই ; কিছুতে আকৃষ্ট হইবার বা কিছুকে দ্বেষ করিবার শক্তি তাহার নাই ; শুধু যেন একটা অর্দ্ধ-জান্তব, অর্দ্ধ-মানব প্রেরণার বশে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আজ সে মুখে একটা তীব্র হিংস্রভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। দামোদরের ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি দুদিকের মাংস-স্তূপের নীচে লুকাইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা হইতে যেন একটা বিশ্রী তীব্র দাহ বাহির হইয়া আসিতেছিল।

সে তাহার মোটা ঠোঁট দুটি উল্টাইয়া একটা বিকট ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "আমি তার ভাই ?" বলিয়াই মুখ অর্দ্ধ ব্যাদান করিয়া কট্‌মট ভাবে চাহিয়া রহিল।

রেবা তাহার দিকে ক্ষিপ্তদৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, "তুমি যাও, বল্‌ছি।" দামোদর ততোধিক ক্ষিপ্তভাবে বলিল, "কেন যাব ?" বলিয়া নেহাৎ বৈষয়িকভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া আমার কাছে বসিয়া বলিল, "বাবু-সাহেব, আপনাকে আমার কথা শুন্‌তে হবে।"

আমি বলিলাম, "দামোদর রাও, তোমার সম্বন্ধে কোনও কথা হচ্চে না। তুমি কেন রাগ করচ ?"

দামু আমার মুখের দিকে একবার, রেবার দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "কথা হোক বা না হোক, আমার কথা আপনি শুনে নিন্‌।"

রেবা হঠাৎ অর্দ্ধচীৎকারের স্বরে বলিল, "তোর কি কথা, বেরো এখান থেকে।"

দামু দৃঢ় হইয়া চেয়ারে বসিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসিতে যেন একটা দুরন্ত উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। ভেক সাপের মাথায় পদাঘাত করিতে পারিলে যেমন উল্লসিত হইত, তেম্‌নি।

দামু বলিল, "বাবুসাহেব, একে আমি দেশ থেকে এনে এতকাল যাবৎ খাইয়ে পরিয়ে রেখেচি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "তা রাখবে না ? এ'ত তোমার বোন।"

দামুর হাসি ফটকাবাজির মত ফুটিয়া উঠিল। রেবার প্রতি চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল, "সে আমার বোন ?...বাজে কথা ! মিছে কথা !" বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল।

রেবা আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি কথা ?"

দামু কথার সুরটা কতকটা স্বাভাবিক করিয়া বলিল, "তাকেই জিজ্ঞাসা করুন না, বল্‌বে।" বলিয়াই আবার বলিল, "না বলে তো

আমি বল্‌ছি। সে কখনই আমার বোন নয়। সে সোনার-বেনের মেয়ে, আমি সারস্বত ব্রাহ্মণ।”

আমি অবাক্‌ হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। ইহাতে সে আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল, “সে আর আমি একই স্কুলে পড়্‌তাম। তাতে আমাতে খুব ভাব ছিল, যদিও সে আমাকে নীচের শ্রেণীতে ফেলে্‌ উপরে উঠে গিয়েছিল,” বলিয়া রেবার দিকে চাহিল। রেবা যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। সে দামুর চোখে চোখে চাহিতে সাহস পাইল না।

দামু বলিতে লাগিল, “সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠ্‌তেই তার বাপ মারা যায়। তারপর তাদের বাড়ী-ঘর নীলাম হ’য়ে ছারখার হ’য়ে গেল। রেবার বয়স তখন পনের ষোল? না রেবা?”

রেবা উত্তর দিল কি না, দেখিলাম না। আমি শুধু দামুর ক্ষুদ্র ইঁদুরের মত চোখ আর মোটা উল্টানো ঠোঁট দুইটির দিকে চাহিয়া ছিলাম।

দামু বলিতে লাগিল, “হ্যাঁ, রেবার বয়স পনের কি ষোল ছিল। তার মা তার বিয়ে দিলেন বুড়ো শঙ্কররাও মানগাওকরের সঙ্গে। এমন রূপসী মেয়েকে বুড়োর হাতে দিলেন দেখে লোকে হায়, হায় করলো। কিন্তু গরীব মা, কি করবে? বেচারী বিয়ে দিয়ে কিছুকাল পরেই মারা গেল।”

ক্ষণকালের জন্য আমি বক্ষ্যমাণ বিষয় ভুলিয়া গেলাম, এবং নির্ব্বোধের মত ঐ বিকৃত-মুখ যুবকটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। দামু বলিয়া যাইতে লাগিল—

“দুবছর পরে প্লেগ হয়ে শঙ্কররাও-ও মারা গেলেন। তার টাকা-পয়সা ছিল মন্দ নয়। কিন্তু তা নিয়ে রেবার সঙ্গে তার দেবর আর

যায়েরা ভয়ানক ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলে। রেবা পড়ল মহা ফাঁপরে। একদিন আমায় ডেকে, যত্ন করে খাবার খাইয়ে বললে, 'দামু, তোর তো পড়াশোনা হ'ল না, হবেও না। তুই বম্বে গিয়ে একটা কাজ-কারবার করে খা না।' আমি বল্‌লাম, 'মন্দ কি, তবে পয়সা কই?' সে আমায় অনেক টাকা দিলে; বম্বে রওনা হবার আগের দিন ডেকে বল্‌লে, 'দামু, কাকেও বল্‌বিনে, তুই তোর সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল্।' গোপনে জাহাজে চড়ে, দুজনে মিলে বম্বে চলে এলাম।"

বলিতে বলিতে একটা ঢোঁক গিলিয়া দামু আবার আরম্ভ করিল, "বম্বে এসে ঠিক হল, আমি কাপাসের ব্যবসা করব, সে স্কুলে পড়বে। রেবা স্কুলে ভর্ত্তি হ'ল, এবং একবছর পরে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে গেল। কিন্তু আই-এ ফেল করে পড়া ছাড়ল, আর তার সব টাকা-পয়সা আমাকে দিয়ে দিল।

"কিন্তু আমিও আমার রোজগার এনে তার হাতে দিয়েচি। এখন কি না সে আমাকে তার চাকর বলে মনে করে। বলে, আমি যখন তাকে বিয়ে করিনি, তখন সে আমার সঙ্গে আর ঘর করবে না। বলুন তো বাবুসাহেব, আমি হলাম সারস্বত ব্রাহ্মণ, আর সে সোনার-বেনে, তাতে আমাতে কেমন করে বিয়ে হয়?"

বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া অভিযোগের সুরে বলিতে লাগিল, "আমার সঙ্গে এতকাল ঘর করলে, তা'তে বিয়ের দরকার হ'ল না, এখন বল্‌চে কিনা, 'তুমি যখন আমায় বিয়ে করনি, তখন আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি, আমি অপরকে বিয়ে করব।' দেখুন, কি নিমকহারাম?"

বলিয়াই সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং হৈ চৈ করিয়া আবার ষ্টোভ ধরাইতে প্রবৃত্ত হইল।

রেবা নির্ব্বাক্, আমি নীরবে বসিয়া। সে নীরবতা শত শত মণ পাথরের বোঝার মত আমার বুক চাপিয়া ধরিল। মনে হইল, যেন কোন্ এক অজ্ঞাত প্রহেলিকার মধ্যে পথ হারাইতে হারাইতে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি।

আমার কণ্ঠস্বর যে কোনও দিন কাঁপিতে পারে, আর্দ্র, রুদ্ধ হইয়া আসিতে পারে, তাহা ভাবি নাই। কিন্তু এখন তাহাই হইল। অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবা, দামু যা বলেচে, তা সত্য না মিথ্যা ?"

সে ধীর কণ্ঠে বলিল, "সত্য"।

"সব সত্য ?"

"সব।"

আমি উঠিলাম। দাঁড়াইতেই রেবা তাড়াতাড়ি গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িয়া আমার ত্নহাত জড়াইয়া ধরিল।

আমি বলিলাম, "ছাড়।"

রেবা আরও দৃঢ়ভাবে আমার হাত আঁকড়াইয়া ধরিল। তাহার করদ্বয়ের বেষ্টন যেন প্রাণের এক অসীম আবেগ নিবেদন করিতেছিল।

আমি ক্ষণকাল মূর্খের মত তাহার লুণ্ঠিত দেহের পানে তাকাইয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে আমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, "তুমি তার সঙ্গে এতদিন ঘর করেচ ?"

রেবা বলিল, "হ্যাঁ"। তাহার কণ্ঠে একটা কৃত্রিম দৃঢ়তা। মনে হইল, যেন সত্য বলিবার একটা প্রবল ইচ্ছা সমস্ত মনকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

রেবা তাহার অশ্রুপ্লাবিত চক্ষু ত্নটি আমার দিকে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

আমি বলিলাম, "রেবা!"

রেবা আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "আমি অনন্যোপায় হ'য়ে দামোদরের সঙ্গে ঘর করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখি, সে মুহূর্ত্ত হ'তে আমার সমস্ত জীবন বদ্‌লে যায়। আমি ভাবি, তুমি ভিন্ন আমার কেউ নেই। তুমি কেন আমায় ভালবাস্‌লে?"

বলিতে বলিতে চোখের জলে আমার পা ভাসাইয়া দিল।

তার পর একটু সংযত হইয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি। যেদিন তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলেছিলে, সেই দিনই তোমাকে ডেকে সব কথা খুলে বল্‌ব মনে করেছিলাম। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন বল্‌তে সাহস হল না।"

তারপর আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "প্রথম দিন যদি তোমাকে সব কথা খুলে বল্‌তে পারতাম, তবে এত গোলমাল হ'ত না।"

তাহার সে কথার সুরে আমার বুদ্ধি জাগ্রত হইল। আমি বলিলাম, "রেবা, এখন আমি আসি, পরে এসব বিষয়ের আলোচনা করা যাবে।"

রেবা যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি সেখান হইতে সোজা মেসে গেলাম। গিয়া চিঠির কাগজ খুলিয়া লিখিলাম, "রেবা, তুমি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী বালিকা। তোমার আমার বিবাহ যে অসম্ভব, তাহা তোমার বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই। তোমরা দুজনে সুখে থাক, আমি বাকী জীবনে তোমাদের শান্তিভঙ্গ করিতে আসিব না।"

সে দিন সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া ই, আই, আর মেলে উঠিয়া বসিলাম।

১৪

কলিকাতা হইতে সোজা বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রায় সপ্তাহ-ব্যাপী পথক্লেশের পর এক নির্ম্মল প্রভাতে জনবিরল গ্রামপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দুইদিকে শিশিরভেজা গাছপালার উপর প্রভাতের সুন্দর আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গাছে গাছে পাখীদের নানা রকমের কাকলি উঠিয়াছিল।

প্রকৃতি যেমন শুদ্ধ, এখানে মানুষের জীবনও তেমনি শান্ত। কোথায় সেই বম্বে—যেখানে অট্টালিকার পর অট্টালিকা বিরাট্ হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ অবিরত অজস্র স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে, যেখানে মিনিটে মিনিটে যানবাহন রাস্তাকে মাতাল করিয়া তোলে ;—আর কোথায় এ ছোট্ট গ্রাম, তার কুড়ে ঘর,—তার শাদা মেটো পথ, তার মুষ্টিমেয় অধিবাসী, আর তাহাদের সরল শিথিল জীবনযাত্রা!

আমি বাড়ী আসিয়াছি সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধেরা আসিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। তরুণেরা অসীম কৌতূহল-পরবশ হইয়া আমার সঙ্গ লইল। দুচার দিনের মধ্যে গ্রামের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন মিশিয়া গেল। প্রভাতে একখানি নৌকা লইয়া নদীর উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতাম ; দুপুরে মৃদু ঢেউয়ের মধ্যে গা ভাসাইয়া নদীতে স্নান করিতাম ; বিকালে গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া রাখালদের মেঠোসুরের আর মাঝিদের ভাটিয়ালী গান শুনিতাম ; সন্ধ্যায় নদীতীরে বেড়াইতাম, আর নূতন শস্যের গন্ধভরা বাতাস প্রাণ আমোদিত করিয়া তুলিত।

জ্যোৎস্না-রাত্রে নদীর ঘাটে একা একা বসিয়া ভাবিতাম, কেন এ শান্তির নীড় ছাড়িয়া বাহির হইলাম? কেন আমি পিতা-পিতামহদের

ভিটায় পুরুষানুক্রমিকভাবে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিলাম না? কেন আটগাঁ ছাড়িয়া ঢাকা গেলাম, কলিকাতা গেলাম, রেঙ্গুন গেলাম, বম্বে গেলাম? কেন এ সুখের আবেষ্টন ফেলিয়া সুদূরের দুঃখকে বরণ করিতে ছুটিলাম?

ভাবিতাম, আটগাঁ আমার জন্মভূমি, আমার পূর্ব্বপুরুষদের একমাত্র কর্ম্মভূমি। আমি কেন ইহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিরাট্ নগরের বিচিত্র জীবনলীলায় যোগ দিতে গেলাম?

কিন্তু এভাব বেশীদিন স্থায়ী হইল না। দুই মাস না যাইতেই মনের নীরব কোণে অসন্তোষের বীজ অঙ্কুরিত হইল। গ্রামের লোকের গতিবিধি আমার কাছে অতিরিক্ত রকম মন্থর বলিয়া মনে হইতে লাগিল; তাহাদের আলাপ আলোচনা অনেকটা অর্থহীন, আলস্য-জড়িত, শুধু সময় কাটাইবার অজুহাত মাত্র বলিয়া বোধ হইল। দেখিলাম, তাহাদের জীবনে উদ্যম নাই, উৎসাহ নাই, উল্লাস নাই। তাহাদের চরিত্রে বৈচিত্র্য নাই। তাহাদের চিত্তে সহজবৃত্তি আছে, কিন্তু সঙ্কল্প নাই।

ধীরে ধীরে মনের মধ্যে অবসাদ দেখা দিল। একদিন হঠাৎ দেখিলাম, দেহ-মনে যেন মরিচা ধরিয়া যাইতেছে, সব শক্তি যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

ধীরে ধীরে আবার সহরের ত্রস্ত চঞ্চলতা আমায় আহ্বান করিল; জনতার কোলাহলের স্মৃতি চিত্ত অধীর করিয়া তুলিল। গ্রামে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদিন প্রভাতে জিনিস-পত্র গুছাইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম।

১৫

কলিকাতা আসিয়া মনের অবসাদের মাত্রাটা বাড়িয়াই চলিল।

সেখানে নিজেকে বড়ই একা মনে করিতে লাগিলাম। চারিদিকে কর্ম্মস্রোত, আমি অলস। এ ভাব দূর করিবার জন্য দিনের পর দিন শহরের সমস্ত সভাসমিতি, আমোদ-উৎসবে যোগ দিতে লাগিলাম। কিন্তু সে সবের মধ্যে আমার আরও বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগিল, আমি জগৎ হইতে ছাড়া ; স্রোতের পাশে আবদ্ধ কাষ্ঠ-খণ্ডের মত।

মনে হইল, যেন আমি নিজের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য জগতের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি কিন্তু পদে পদে জগৎ আমাকে উপেক্ষার সহিত সরাইয়া দিতেছে। যেন নিজের ঝটিকাক্ষুব্ধ চিত্ত হইতে সংসারের শ্যামল তীরের দিকে হাত বাড়াইতেছি, কিন্তু সে হাত আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

একথাটি অতি নিষ্ঠুর হইয়া জাগিল একদিন, যখন অনন্যোপায় হইয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম। সিঙ্গাপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কেইরো পর্য্যন্ত কত শহরের চিত্রগৃহেই না প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু সেবার একদিন কলিকাতায় যে অবস্থায় পড়িয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম, এমনটি আর কোনও দিন হয় নাই।

আমি কলেজ ষ্ট্রীটের একটা সরু গলিতে কেরাণীদের এক মেসে থাকিতাম। সেদিন বিকালে মেসের সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, শুধু আমি ঘরে একা বসিয়া ছিলাম। তখন আমার চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই ; চিত্তে যেন কোনও খেদ নাই, কোনও আশা নাই। আমার পিছনে অতীত নাই, সাম্‌নে ভবিষ্যৎ নাই। শুধু একটা শূন্য বর্ত্তমান চারিদিকে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল। আমি ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিকের ঘর-বাড়ীগুলি যেন একটা অস্পষ্ট

কুহেলিকায় ডুবিয়া গেল নিজের প্রতি নিজের আতঙ্ক হইতে লাগিল। ভাবিলাম, কি করি ?

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলাম, পাইলাম না। সাম্‌নে একটা খবরের কাগজ পড়িয়াছিল, তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, সিনেমার বিজ্ঞাপন। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া এসপ্লেনেডের ট্রাম ধরিলাম।

চিত্রগৃহে গিয়া বসিলাম। কিন্তু দারুণ তৃষ্ণার জ্বালায় নিজের হাতের রক্ত চুষিয়া যেমন তৃপ্তি হয় সে-সন্ধ্যায় তার চেয়ে বেশী তৃপ্তি আমি পাই নাই।

সিনেমা শেষ হইলে গড়ের মাঠের দিকে গেলাম। মাঠের মাঝখানে ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলাম। নির্ম্মল আকাশে তারকা-পুঞ্জ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। তাহারা যেন আমাকে কি বুঝাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না।

হঠাৎ ভাবিলাম, আমি নিজের সঙ্গে নিজে এ কি লুকোচুরি করিতেছি! দেহের সারা রক্ত স্পন্দিত হইয়া বলিল, এ কী লুকোচুরি!

নীরব বনপথে যখন দস্যু পথিকের সঙ্গ লয়, তখন দুজনে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে পথ চলে। তারপর পথিক বুঝিতে পারে, এ দস্যু। তবুও স্বাভাবিক ভাবেই পথ চলিতে চেষ্টা করে। জানে, মাঠটা পার হইয়া বনের ধারে গিয়াই তাহার বুকে ছোরা বসাইবে, তথাপি সহজ ভাবেই চলে। বুঝাইতে চায়, যেন সে তাহাকে পথিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কিছু মনে করে নাই। কিন্তু হঠাৎ জ্যোৎস্নালোকে পথিকে দস্যুতে চোখোচোখি হয়। দস্যুর ক্রূর দৃষ্টিতে বিজয়ের হাসি ফুটিয়া ওঠে। তখন দুজনার স্বাভাবিক পথচলা শেষ হইয়া যায়।

আমারও আজ তেমনি হইল। এতকাল আমি প্রাণপণে একটা

কঠোর নিষ্ঠুর সত্যকে ফাঁকি দিয়া চলিতেছিলাম, আজ গড়ের মাঠে নক্ষত্রময় আকাশের তলে তাহা সবলে নিজেকে প্রকাশ করিল।

আমি বম্বেতে তাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছি!

সে তাহার প্রাণের অসীম আবেগ দিয়া আমাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহার কম্পিত কোমল হাতদুটি দিয়া আমার হাত জড়াইয়া ধরিয়াছিল, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া, হাত ছিনাইয়া চলিয়া আসিয়াছি!

ভাবিলাম, বম্বের বাড়ীর সামনে ট্যাক্সিতে ওঠার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সিনেমায় আসা পর্য্যন্ত, প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার হাতে সে দৃঢ় কোমল আবেষ্টন অনুভব করি নাই কি?

আজ আগুনের মত আমার হাতদুটি বেড়িয়া জ্বলিয়া উঠিল সেই স্নিগ্ধ-কঠিন স্পর্শ! এক সুন্দরী তরুণীর প্রাণের অসীম ব্যথাভরা, বেদনাভরা, আশাভরা একটি কাতর স্পর্শ!

আমি তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া আসিয়াছি! যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাকে সুদূরে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি!

আকাশের তারকা-লহরীর পানে চাহিতে চাহিতে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, সুন্দর একটি মুখ, অশ্রুভরা, অসীম বেদনায় ম্লান, আমার পানে অসহায় ভাবে চাহিয়া আছে!

বিদ্যুতাহতের মত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

বিদ্রোহীদল যেমন নিরর্থক কোলাহল করিতে করিতে হঠাৎ একটা কর্ম্মের আহ্বান পাইয়া দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া যায়, তেমনই দুরন্তভাবে আমার চিত্ত ঘোষণা করিল,—বম্বে যাব, তাকে গ্রহণ করব, সে আমার!

১৬

যেখানে স্থির সঙ্কল্প থাকে, আশা থাকে, সেখানে মন চিন্তায় বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হয় না। চিন্তা বরং তখন মনের একটা বিলাস। ব্যসনের মত ইহাকে নেশায় মত্ত করিয়া রাখে।

সেদিন গড়ের মাঠ হইতে ফিরিবার পর তেমনই চিন্তাজাল আসিয়া বিনিদ্র শয্যার উপর আমাকে জড়িত করিল।

ভাবিলাম, রেবা দামুর সঙ্গে ঘর করিতেছিল, এ-কথায় চিত্ত এত অধীর হইল কেন? মন অসীম অবজ্ঞাভরে বলিল,—দামু কে? সে তো দুর্দ্দিনের সুযোগ পাইয়া দস্যুর মত তাহার পতির আসন দখল করিতে চাহিয়াছিল। রেবা কি তাহাকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে? ঘটনা-বিপর্য্যয়ে যদি তাহাকে তাহার সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে হইয়া থাকে, তাহাতে তাহার প্রকৃত চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইবে কেন?

মন জোরের সহিত বলিল,—কই তাহার চিত্ত তো স্থির অম্লান রহিয়াছে, দামুর সংস্পর্শ তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিটিকে একটুকুও নিস্প্রভ করিতে পারে নাই। মন ভাবের স্রোতে বলিয়া যাইতে লাগিল,—যদি বা সে দামুর বিবাহিতা পত্নীই হইত, তথাপি কি আসিয়া যাইত? সে বিবাহের মূল্য কতটুকু?

ভাবিলাম, যেখানে খাঁটি প্রেম, সেখানেই বিবাহ। ইহার বাহিরে, ইহা ভিন্ন বিবাহ নাই।

ভাবিলাম,—মানুষ নিজের ইচ্ছা দ্বারা জোড়া বাঁধিতে পারে, কিন্তু প্রেমই সেই জোড়ার একমাত্র বন্ধন। যেখানে সে বাঁধন নাই, সেখানে চূণহীন ইটের গাঁথনীর মত সে জোড়া আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে।

সে দিন মনের সামনে এ-কথাটি অতি স্পষ্ট, পরিষ্কার হইয়া উঠিল যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি যতই প্রবল হউক, প্রকৃতির দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ নিয়মের

কাছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। মানুষ যত যত্নেই সংসার গড়ুক না কেন, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ, সেখানে তাহা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

নীরবে শয্যার উপর শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, পাশের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতে লাগিল।

মনে হইল, প্রকৃতির নিয়ম, 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন'। অযোগ্য যোগ্যতরের কাছে পরাস্ত হইবেই। কারওয়ারের শঙ্কররাও ভাবিয়াছিল, রেবা জীবনে-মরণে তাহার সম্পত্তি। যতদিন উদ্বর্ত্তনের অবকাশ ছিল না, ততদিন বাস্তবিকই রেবা শঙ্কররাওয়ের সম্পত্তি ছিল। মৃত্যুর পরেও তাহার গৃহে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রকৃতির দুর্দ্দম নিয়মে তাহা ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইল, দামুর সঙ্গ লইল। কিন্তু ঐ স্থূলকায় স্থূলবুদ্ধি দামোদর কি তাহার উপযুক্ত স্বামী? প্রকৃতির রাজ্যে কি সেই অপরূপ সুন্দরী তরুণীর স্থান সেই পশুপ্রকৃতি যুবকের সঙ্গে? কখনই নয়। প্রকৃতি তাই তাহাকে আমার পাশে পাইয়াই আমার সঙ্গে বাঁধিতে চাহিল। প্রকৃতি যোগ্যতমকে পাইয়াছে, তাই প্রেম এত গভীর, এত সত্য।

ঘড়ি ঢং ঢং করিয়া জানাইল, মধ্যরাত্রি হইয়াছে। কিন্তু তথাপি চিন্তাস্রোত থামিল না। মন পরম উল্লাসের সহিত বলিল,—সমাজে ডিভোর্স চাই, মুক্ত অব্যাহত ডিভোর্স। তাহা না হইলে মানুষের গার্হস্থ্য জীবন প্রকৃতির মুক্ত নির্দ্দেশ পালন করিবে কি করিয়া? আকস্মিক বিদ্যুতালোকে যেমন পথিকের চক্ষুর সামনে হঠাৎ মাঠ, বন, পাহাড়, উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া ওঠে, তেমনই নিমেষের মধ্যে যেন একটা গূঢ় সত্য আমার কাছে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিল।

ভাবিলাম, যে-ধারণার বশীভূত হইয়া আমি বিধবাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, সে-ধারণা আমাকে স্বামিবিচ্ছিন্নাকে বা

স্বামিপরিত্যক্তাকে বিবাহ করিতে প্রণোদিত করিবে না কেন? এ দুইয়ে প্রভেদ কোথায়? জীবিতা স্ত্রীর উপর মৃত স্বামীর সে অধিকার, রেবার উপর দামুর মত অপদার্থ ব্যক্তির তার চেয়ে বেশী কি অধিকার আছে? রেবা যে-মুহূর্ত্তে আমাকে ভালবাসিয়াছে, দামোদর সে-মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার নিকট মৃত।

এ-সব চিন্তার মধ্যে মনের একটা অংশ স্তম্ভিত হইয়া গেল, যেন শঙ্কিত হইয়া এ-সব যুক্তি শুনিল। তাহারই কোণ হইতে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, মানব-সমাজ প্রকৃতির দাস নয়, প্রকৃতির প্রভু; প্রকৃতির হুকুম মানে না, প্রকৃতিকে হুকুম দেয়। জড়-জগতের দিকে চাহিয়া দেখ, সমাজ কেমনভাবে প্রকৃতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। তেমনই মনোজগৎকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা তাহার ধর্ম্ম।

সভায় ওজস্বী, চিত্তরঞ্জক বক্তার সম্মুখে কোনও প্রতিবাদকারী উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে যেমন সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বসাইয়া দেয়, তেমনই করিয়া এ-প্রশ্নকে দাবাইয়া দিয়া মনের সতেজ সপ্রতিভ দিক বলিয়া উঠিল,—তা যদি সমাজের ধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্ম আমি চাই না।

মনে হইল, আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকা; তাহাদের নূতন সমাজ-গঠন; তাহাদের অক্ষুণ্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; তাহাদের মুক্ত প্রেম। মনে পড়িল, আমেরিকার বিবাহ-আইন সংস্করণ, বলশেভিকের অবাধ দাম্পত্য সম্বন্ধ। আজ আমার কাছে এ সকল অতি সহজ স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

নিজের মন যাহা চায়, তাহা যদি বাহিরের জগৎও সমর্থন করে, তবে একটা স্বাভাবিক তৃপ্তি জাগে। সে কারণেই বোধ হয় সমস্ত চিন্তার শেষে একটা গভীর শান্তি আসিল। বাকী রাত আমাকে আর বিনিদ্রভাবে কাটাইতে হইল না।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। নীচে স্নানের ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ, চাকরদের কাজের কোলাহল। ঘুম ভাঙ্গিয়া মনে হইল, কি জানি কেমন একটা মধুর স্বপ্ন দেখিয়ছি। কিন্তু শুধু স্বপ্নের মাধুর্য্যের ছাপটাই ছিল, স্বপ্ন কি মনে পড়িতেছিল না।

১৭

তারপর যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলাম, তাহা খুবই অস্বস্তির মধ্যে কাটিল। কেন-না, তখন আমার মন কলিকাতা ছাড়িয়া আরব সাগর কূলের এক হর্ম্ম্যময় নগরের একপ্রান্তে বিচরণ করিতেছিল। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার জন্য শুধু দেরী হইল। সে কয়দিন যেন আমি ঠিক প্রবাসীর মত কলিকাতায় বাস করিতেছিলাম। যেন আমার সব কিছু বম্বেতে, ভারতের পশ্চিম প্রান্তে, এস্থান শুধু দুদিনের আশ্রয়-স্থল। একদিন বিকালে কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চে বসিয়া এক পূর্ব্বপরিচিত ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম। বিষয় ছিল, কলিকাতা ও বম্বে। আমি পরম উৎসাহে কলিকাতা হইতে বম্বের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতেছিলাম। কলিকাতায় গঙ্গা আছে, গড়ের মাঠ আছে, কিন্তু বম্বের মত সমুদ্র কই, চৌপাটি কোথায়? কলিকাতায় ইডেন গার্ডেন আছে, কিন্তু বম্বের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন ছোট হইলেও চমৎকার। কলিকাতার চৌরঙ্গী, পার্ক ষ্ট্রীট তো বিদেশীর সমৃদ্ধি ঘোষণা করে, কিন্তু বম্বের মালাবার হিল দেশী লোকের সম্পত্তি। কলিকাতার রাস্তাঘাট ভাল, কিন্তু বম্বের মত সারি সারি ছ'তলা বাড়ী কই?

আমার শ্রোতা আমার স্বদেশ-প্রীতির অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, যদি আমাকে কলিকাতা ও বম্বের প্রকৃত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে হইত, তবে বলিতে হইত, বম্বেতে রেবা আছে, কলিকাতায় রেবা নাই!

রেবার স্মৃতি এখন আমার সমস্ত মন অধিকার করিয়া বসিল।

বাঙ্গালী মহিলাদিগকে দেখিয়া মনে হইত, যেখানে রঙ্ জ্যোৎস্নার মত নয়, নাসিকা তুঙ্গ, তীক্ষ্ণ নয়, দেহ ক্ষীণ ও দীর্ঘ নয়, সেখানে রূপ কোথায়? রঙ্গিন শাড়ী ছাড়া নারীর পোষাক হইতে পারে? আর সে শাড়ীতে যদি কাছা না রহিল, তবে তো তাহা দেহের বেষ্টন নয়, তাহার আচ্ছাদন মাত্র।

সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকা আসিলে বম্বে যাওয়ার আয়োজন করিলাম। চিত্ত যে কেমন করিয়া এত সবল হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। মনে হইল, নিজের ভিতরে কোন্ শক্তি কি ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, তাহার সন্ধান কতটুকু বা জানি? আমি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলাম যে, আমার বিচার-শক্তি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আমার জন্য সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, প্রকৃত পথ খুঁজিয়া দিয়াছে, —কিন্তু কে জানে সে যুক্তির প্ররোচনা, না তাহা অপেক্ষা প্রবলতর কোনও মনোবৃত্তির প্রেরণা, যাহাকে যুক্তি শুধু নিজের মান বজায় রাখিবার জন্য আগ্‌লাইয়া রাখিতে চায়?

১৮

আষাঢ়ের এক বৃষ্টি-সিক্ত অপরাহ্নে কলিকাতা ছাড়িয়া যাত্রা করিলাম। হাবড়ার প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে যখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, তখন সমস্ত দেহের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয় মুক্তির আনন্দে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন আমি আমার পুরাতন সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া প্রাণের সার্থকতা লাভ করিতে ছুটিয়াছিলাম।

কলিকাতায় পড়িবার সময় একবার আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দিরে একটা অভিনব ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। আচার্য্য যন্ত্র-সংযোগে

দেখাইয়াছিলেন, একটা পাতাকে গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া মাত্র তাহাতে কেমন মুহুর্মুহুঃ স্পন্দন হইতে থাকে। আজ হয়ত আমার জীবন-পত্র সমাজ-বৃক্ষ হইতে ছিন্ন হইয়া তেমনই ক্ষিপ্রভাবে স্পন্দিত হইতেছিল !

ষ্টেশনের রেল লাইনের জটিল আবেষ্টন ছাড়াইয়া যখন গাড়ী বাহিরের খোলা মাঠে আসিয়া পড়িল, তখন আমার মনে দস্তুরমত একটা আনন্দলহরী খেলিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, প্রতিমুহূর্ত্তেই আমি রেবার নিকটবর্ত্তী হইতেছি; প্রত্যেক দুই মিনিটে বারশো তেইশ মাইলের ব্যবধানের এক একটি মাইল করিয়া কমিতেছে। সহযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলিবার সময় একটা অব্যক্ত পুলক আমার প্রতিবাক্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল,—তাহা আমি বুঝিয়াও গোপন করিতে পারিতেছিলাম না।

সন্ধ্যায় গাড়ী টাটানগর অতিক্রম করিয়া গেল। তারপর বেঞ্চে শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম।

এ ভাবনা আকাশ-কুসুম রচনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভাবিলাম, রেবাকে বেশ ভদ্রসঙ্গতভাবে এক "সমাজের" সাহায্যে বিবাহ করিব। বিবাহের পর বম্বের বাহিরে একটি বাড়ী লইব। সেখানে দুজনে নিবিড় শান্তিতে থাকিব। সকালে বিকালে সমুদ্রতীরে দুজনে বেড়াইতে যাইব। দুপুর বেলা আমি যখন আফিসে বাহির হইব, তখন রেবা জানালা হইতে ঝুঁকিয়া আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে। স্যাণ্টাক্রুজের সুন্দর বাগান-ঘেরা একটি বাড়ীর কথা মনে হইল; কল্পনায় দেখিলাম, সেই বাড়ীর উপরের জানালার পর্দ্দা সরাইয়া রেবা নীচের দিকে চাহিয়া আছে, আমি সম্মুখের রাস্তা দিয়া ষ্টেশনের দিকে দ্রুতপদে চলিয়াছি। সন্ধ্যায় সে-গৃহের দীপোজ্জ্বল কক্ষে রেবা প্রাণ খুলিয়া গান গাহিবে, আমি বসিয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিব। বিশেষ করিয়া রেবা আমার শেখানো বাঙ্গলা গানগুলি গাহিবে, তাহার মধুর বিদেশী কণ্ঠে বাঙ্গলা

পদগুলি অপূর্ব্ব লালিত্যে ভরিয়া উঠিবে,—যেমন করিয়া শ্বেতওয়ার্ড়ীর বাড়ীতে উঠিত !

ভাবিলাম, কে জানিবে সে কে ? আমি কে ? বিশ্বের এক কোণে আমাদের সুন্দর প্রেমের নীড় রচনা করিয়া দুজনে বিমল আনন্দে দিনপাত করিব। সমাজ, সংসার, এ সব বড় বড় কথায় আমাদের কাজ কি ? আমাদের প্রেমই আমাদিগকে বিশ্বের মহত্তম সাফল্য আনিয়া দিবে।

সে রাত্রির ভাবনা কখন যে স্বপ্নে ডুবিল, স্বপ্ন কখন আবার ভাবনায় পরিণত হইল, তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। প্রভাতে চোখ মেলিয়া দেখিলাম, দুই দিকে মধ্য প্রদেশের বিস্তীর্ণ মাঠ বিছাইয়া পড়িয়াছে। এবং দূরে কে যেন তুলি দিয়া কতকগুলি পাহাড় আঁকিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিপ্রহরে গাড়ী নাগপুরে আসিল। এখানে আমাদের কামরায় মহারাষ্ট্রীয় যাত্রী উঠিল। মনে হইতেছিল, তাহারা যেন আমার আত্মীয় !

নাগপুরে আধ ঘণ্টা থাকিয়া গাড়ী আবার ছুটিল। অপরাহ্নে বেরারখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিলাম। একের পর এক বড় বড় ষ্টেশন পার হইয়া যাইতে লাগিলাম। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর রাশি রাশি তুলার বস্তা বিপুল ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেছিল।

সারা রাত্রিতে খান্দেশ অতিক্রম করিলাম। শেষ রাত্রের দিকে গাড়ী নাসিকে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা গভীর শীতল স্পর্শ জানাইয়া দিল, এ এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রভাতে ছ'টায় গাড়ী কল্যাণ পৌঁছিল।

কল্যাণে গাড়ী থামিতেই মনটা কাঁপিতে লাগিল। নবীন যুবক চাকরীর উমেদারী করিতে গিয়া বড়সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইয়া

বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে করিতে কল্পনায় নানা রঙীন চিত্র গড়িতে থাকে, তারপর হঠাৎ যখন পেয়াদা আসিয়া বলে, "সাহেব ডাকৃছেন, আসুন", তখন যেমন করিয়া তাহার বুক ধড়ফড় করিয়া উঠে—আমারও তেম্‌নি হইল। কল্যাণ ছাড়িয়া গাড়ী বম্বের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমার মনের চঞ্চলতা ততই বাড়িতে লাগিল।

১৯

বম্বে গাড়ী সাতটায় পৌঁছিল। মেসে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় আটটা বাজিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সহবাসী ও সহকর্ম্মীরা আসিয়া জুটিলেন। একজন বলিলেন, "রমেনবাবু যে! ব্যাপার তো মন্দ নয়! আপনি না ব'লে ক'য়ে অম্‌নি চলে গেলেন, চাকরি বুঝি এতই সোজা!" কিন্তু জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা হইতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ প্রেরিত দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। আর তেমনই আনন্দিত হইলাম, সে প্রভাতের স্নানে। কলের ঝাঁঝরী হইতে নির্ঝরে জল পড়িতেছিল, তাহাতে দেহ স্নিগ্ধ-শীতল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আজ হইতে আমার পূর্ব্বের শত সংস্কার, শত আচার এমনি করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া নিজেকে শুদ্ধ স্নিগ্ধ করিয়া তুলিব।

সেদিন আর আফিসে গেলাম না, কেননা আমার ছুটি বাকী ছিল। আফিসে যাইবার সময়েই খেতওয়াড়ী রওনা হইলাম। মনে হইল, গতদিন এমনই সময় গিয়াছিলাম। কিন্তু মন যেন দু'হাতে গতদিনের কথাগুলিকে সরাইয়া ফেলিয়া দিল। ভাবিল, শুধু আজিকার কথা। আজ রেবা দৃষ্টিমাত্রেই কি বলিবে? আমি যখন আমার কথা শেষ করিব, তখন কেমন ভাবে চাহিবে?

২০

সেই খেতওয়াড়ীর বাড়ী। আজ তিন মাস পরে এখানে

আসিলাম। কিন্তু অভ্যাসবশে সহজভাবেই উপরে চলিয়া গেলাম। দামোদরের দরজায় যাইতেই দেখিলাম, একটি মাবল মেয়েমানুষ ঘর ঝাঁট্ দিতেছে।

ভাবিলাম, তাহারা কি এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে? হঠাৎ মনে একটা অসীম হতাশার চিত্র তুলিয়া প্রশ্ন উঠিল, তবে কি তাহারা আবার কারওয়ার ফিরিয়া গিয়াছে?

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেওয়ালে দেখিতে পাইলাম, দামোদর ফড্‌নীসের নামের ছাপ। পিতলের সে পুরাতন অক্ষরগুলি চোখের সামনে অতি স্নিগ্ধভাবে ভাসিয়া উঠিল।

স্ত্রীলোকটি দরজার নিকটে আসিয়া আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ তৈলসিক্ত, চক্ষুর কুটিল দৃষ্টি। ঠোঁটে পানের দাগ স্থায়ীভাবে লাগিয়া আছে। মনে হইল, কেমন কলুষময়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দামোদর রাও কোথায়?"

স্ত্রীলোকটি জড়িতভাবে বলিল, "দামোদর রাও?" বলিয়া থামিল। মুখের ভিতর চিবানো পানের সমষ্টি একপাশে সরাইয়া বলিল, "দামোদর রাও বাইরে গেচে।"

আমি বলিলাম, "কখন আসবেন?"

সে বলিল, "বিকেলে"। বলিয়া আবার পান চিবাইতে ও ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবাতাঈ কোথায়?"

সে ঝাঁটা হাতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, কপাল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "রেবাতাঈ কে?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "রেবাতাঈ তার—," একটু থতমত খাইয়া বলিলাম, "বোন"।

সে অবাক হইয়া বলিল, "সে ত জানিনে।"

আমি বলিলাম, "তার বোন নাও হতে পারে—তার"—আমি কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। একটু ভাবিয়া সহজভাবে বলিলাম, "এ বাড়ীতে রেবাতাঈ বলে একটি মেয়ে থাকত না?"

স্ত্রীলোকটি বিস্মিতকণ্ঠে, জোরে জোরে বলিতে লাগিল, "এ বাড়ীতে রেবাতাঈ! তা তো আমি জানিনে। ও দিকে দেখ।" বলিয়া ঝাটা দিয়া পাশের দরজা দেখাইয়া দিয়া নিজ কাজে মন দিল।

আমি পাশের বাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে ক'দিন আছ?"

সে বলিল, "একমাস।" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দামোদর রাও বিকালে ক'টার সময় আসবেন?"

সে ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিল, "তিনটায়"।

ভাবিলাম, তবে রেবা দামুকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে? প্রশ্নটা শূন্যের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

"সে কি আবার কারওয়ার ফিরিয়া গিয়াছে?"

"অসম্ভব।"

"তবে?"

হঠাৎ মনে হইল, সে যদি আমার খোঁজে গিয়া থাকে!

২১

এ সমস্ত প্রশ্ন বিকালে তিনটা পর্য্যন্ত চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, দামুকে কার্পাসের বাজারে গিয়া খুঁজিয়া নিই না কেন? কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বম্বেতে একজন লোক খোঁজা আর সমুদ্রের উপকূল হইতে একটি বিশেষ কোনও রেণুকে বাছিয়া আনা একই রকমের।

তথাপি দামুর সন্ধানে ছুটিলাম। কার্পাসের বাজারে পৌঁছিতে আধ ঘণ্টা লাগিল। সেখানে অনুসন্ধান করিতে করিতে ফড্‌নীস দুই তিনটি মিলিল, কিন্তু দামুর দেখা পাওয়া গেল না। ওদিকে বেলা তিনটা বাজিয়া আসিল। কাজেই, আবার খেতওয়াড়ীর দিকে ফিরিলাম।

কৃষ্ণসদনে উঠিতে যাইব এমন সময় দেখি দামু একটি কাচের গ্লাসে করিয়া দুধ কিনিয়া লইয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিল, "বাবুসাহেব, অনেক দিন বাদে যে!" তাহার চোখের দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিলাম, তাহার অনেক কথা বলিবার আছে।

দামুর সঙ্গে উপরে উঠিলাম। সে আমাকে আদর-পূর্ব্বক চেয়ারে বসাইয়া ডাকিল, "রক্মা!" ভিতর হইতে সকালের স্ত্রীলোকটি বাহির হইয়া আসিল। দামু তাহার হাতে দুধের গ্লাসটা দিয়া বলিল, "শিগ্‌গির দু'পেয়ালা চা তৈরি কর্, বাবুসাহেবও খাবেন।"

রক্মা আমার দিকে চাহিয়া দামুকে বলিল, "উনিই সকালবেলা এসেছিলেন।" বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কে?"

দামু বলিল, "এর নাম রক্মা।" যেন আমি তাহার নাম জানিতে চাহিয়াছিলাম! তার পর বলিল, "রেবা চ'লে যাবার পর এ এসেচে। রেবার কথা ত আপনাকে বলাই হয় নাই।" আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবা কোথায়?"

দামোদর বলিল, "সে চ'লে গেচে।" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুটি ছোট হইয়া সাপের চক্ষুর মত ঝিলিক মারিতে লাগিল। বলিল, "সে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গেচে।" সহসা যেন তাহার চিন্তাস্রোত বর্ত্তমান ছাড়িয়া অতীতের দিকে ধাবিত হইল। সে বলিল,

"বলুন্ তো বাবুসাহেব, আমার কি দোষ? আমি এমন কি অন্যায় করেচি, যার জন্যে সে আমায় ছেড়ে যেতে পারে?"

আমি যে-কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম তাহা চাপা দিয়া বলিলাম, "এখন বুঝি রক্মা তোমার সঙ্গে থাকে?"

সে বলিল, "হ্যাঁ।"

তখন রক্মা আসিয়া চা রাখিয়া গেল। দামু একটু আবেগের সহিত বলিল, "রক্মা খুব কাজের লোক, বাবুসাহেব।"

আমি দামুর মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিলাম। যে দুদিন পূর্ব্বে রেবার মত অপূর্ব্ব রূপবতী গুণবতী নারীর সাহচর্য্য করিয়াছে, আজ সে অতি সহজ ভাবে এই নীচস্বভাবা মধ্যবয়স্কা মাবল নারীর সঙ্গে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে!

চা পান করিতে করিতে মনের অদম্য কৌতূহল চাপিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবা কবে গেচে?"

দামু পাত্রের চা গলাধঃকরণ করিয়া, চক্ষু বুজিয়া, একটু ভাবিয়া বলিল, 'মাস দুয়েক কিংবা একটু বেশী হ'বে।' তারপর ত্রস্তভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, "বাবু-সাহেব, রেবার ভাব দেখলে আপনি অবাক্ হ'য়ে যেতেন। আপনি চ'লে যাবার পর থেকে সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল, আর সকাল বিকাল কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাত্রিতে এসে রান্না ঘরে গিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে থাকৃত। আমি বলি 'তোর কি হয়েচে?' সে কেবল কাঁদে। আপনার খোজে তিন চার দিন গেলাম। কিন্তু সে বাড়ীতে আপনাকে পাওয়া গেল না, কোথায় গেচেন কেউ বল্‌তে পারল না। রেবা একথা প্রথমে বিশ্বাস করলে না। একদিন আমার সঙ্গে সে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গেল। আমি তাকে গাড়ীতে রেখে ওপরে গেলাম। সেখানে বাঙ্গালী লোকদের কথাবার্ত্তা শুনে তার

বিশ্বাস হ'ল ওটাই আপনার বাড়ী। ফিরে এসে যখন বল্লাম, আপনি নেই, তখন তার মুখটা ছাইয়ের মত হ'য়ে গেল।

"তারপর একদিন তার ভয়ানক অসুখ হ'ল। বার বার ফিট হ'তে লাগল। বড় ডাক্তার ডাকলাম। ডাক্তার বল্লেন, হিষ্টিরিয়া রোগ। আমার তাকে নিয়ে হ'ল প্রাণান্ত। আমি যথাসাধ্য যত্ন করতে লাগলাম। কিন্তু একদিন তাতে আমাতে বিষম ঝগড়া হ'ল।

"আমি রেগে বলেছিলাম, 'বাঙ্গালী বাবুর না পায়ে পড়েছিলি, কই, তোকে তো ঠাঁই দিল না।' একথা শুনে সে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে হস্পিটালে চ'লে গেল।"

আমি বলিলাম, "কোথাকার হস্পিটালে ?"

দামোদর বলিল, "যে ডাক্তার চিকিৎসা করতেন, তাঁরই প্রাইভেট হস্পিটাল আছে, সেখানে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে এখনও সারে নি ?"

দামু সংক্ষিপ্তভাবে বলিল, "সেরেচে বোধ হয়।" তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়া যে রেবার অন্যায় হইয়াছে, সেকথাটা সে বার বার বলিতে লাগিল। দামু যেন তখন চোখের সাম্‌নে রেবার যাইবার দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

তাহার কথা শুনিয়া আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম। নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিলাম, কেন বম্বে ছাড়িয়া গেলাম ? কিন্তু ভাবিয়া তৃপ্তি হইল যে, রেবা দামোদরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। শুধু তৃপ্তি নয়, তাহার প্রতি যেন একটা কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

দামুকে বলিলাম, "দামোদর রাও, তুমি আমাকে রেবার কাছে নিয়ে যেতে পারবে ?"

দামু আনন্দের সহিত বলিল, "খুব পারব বাবুজি। এখনই চলুন, আধ ঘণ্টা পরে।" বলিতে বলিতে সে আমার দিকে গভীর কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিব বলিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

২২

বাহিরে আসিয়া ট্রামে চড়িয়া ফোর্টে গেলাম এবং একটি বড় মনোহারী দোকানে ঢুকিয়া নানাপ্রকার উপহারের জিনিস দেখিতে লাগিলাম। দোকানদার একে একে শেলাইয়ের বাক্স, টয়লেট বাক্স, লিখিবার সরঞ্জামের কেস্, ফ্যান্সি দোয়াত, লিখিবার প্যাড, পেপার প্রেস, ফুলদানি, শেলাইয়ের মডেল বই—প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। হঠাৎ মনে পড়িল, এ সমস্তই বিদেশী, রেবা তো তাহা গ্রহণ করিবে না। তখন সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলাম, মহীশূরে প্রস্তুত একটী ছোট চন্দনের বাক্স, ডালার উপর আঙ্গুরের লতা কাটা।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে খেতওয়াড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং দামুকে লইয়া ডাক্তারখানার উদ্দেশ্যে চলিলাম। সে সেখানে দুইবার গিয়াছিল। ওয়ার্ডেন রোডের উপর সে বাড়ী।

ওয়ার্ডেন রোডের কিছুদূরে ট্রাম হইতে নামিলাম। ডান দিকে মহালক্ষ্মীর ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তারপর সমুদ্র, মাঝখানে পিচ-ঢালা অতি সুন্দর একটি রাস্তা বম্বের উত্তর দিকে গিয়াছে। বাঁ দিকে মাথার উপর খাম্বালা পাহাড়, তাহার ঘরবাড়ীগুলি ছবির মত দেখাইতেছিল। সে পাহাড়ের নীচ দিয়াই ওয়ার্ডেন রোড চলিয়াছে।

দামু ও আমি পাশাপাশি চলিলাম। একের পর এক বড় বড় অট্টালিকা পার হইয়া যাইতে লাগিলাম। তাহার কোনওটা দেশী

রাজার, কোনওটা বা ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীর বাড়ী। প্রায় পনর মিনিট এসব অতিক্রম করিবার পর দামোদর একটা সুদৃশ্য বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইল। বলিল, "এই বাড়ী, ওপরে চলুন।" দুজনে টালি-মোড়া সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম।

প্রথম একটি বড় সুসজ্জিত ঘর। তাহার সামনে পিতলের অক্ষরে লেখা ডাক্তার এম, সি, নেরলকর। তারপরে লেখা—Out (বাহিরে)।

দরজায় একজন ভাইয়া (হিন্দুস্থানী দারোয়ান) বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "ডাক্তার-সাহেব নিজ বাড়ীতে আছেন, ছ'টার সময় আস্‌বেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোগীরা যেখানে থাকে, সে জায়গা কোথায়?" সে আঙ্গুল দিয়া পাশের ঘর দেখাইল।

বারান্দা দিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, এক সারিতে তিনটি ঘর, প্রত্যেকটিতে কয়েকটা খাট পাতা। কিন্তু রোগী দুই তিনটি মাত্র ছিল।

এক কোঠায় একজন কম্পাউণ্ডার বসিয়া ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েদের ওয়ার্ড কোথায়?" সে বলিল, "তেতলায়, সেখানে নার্সকে জিজ্ঞাসা করলে রোগিণী দেখিয়ে দেবে।"

উভয়ে তেতলায় উঠিলাম। দামু বলিল, অন্যবার সে সোজা লিফ্‌ট্ দিয়া তেতলায় উঠিয়াছে, এবার হাঁটিয়া আসাতে দোতলায় আর তেতলায় গোল বাঁধিয়া গিয়াছে।

তেতলার সাম্‌নের ঘরে গিয়া দেখিলাম, একজন নার্স আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের পোষাক ঠিক করিতেছে। আমি বলিলাম, আমরা একজন রোগিণীকে দেখ্‌তে এসেছি।"

নার্স বলিল, "নাম?"

আমি বলিলাম, "রেবাতাঈ"

দামোদর বলিল, রেবাতাঈ ফড়্‌নীস।" নার্স আমার দিকে একটু ক্র কুটিল দৃষ্টিতে চাহিল তারপর বলিল, রেবাতাঈ ব'লে তো নও রোগিণী এখানে নাই।"

দামোদর বলিল, "দুমাস—আড়াইমাস আগে এখানে এসেছিল।"

হঠাৎ নার্সের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটু হাসিয়া, ঠোঁট কাইয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "রেবাতাঈ! রেবাতাঈ ফড়্‌নীস? বটে? াপনারা তার কে হন?"

দামু বলিল, "আমি তার ভাই। আমি তো দুবার তাকে দেখ্‌তে সেচি।"

নার্স বলিল, "তা নিশ্চয়ই দুমাস আগে হবে।"

দামু একটু ভাবিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে।"

আমি দামুর হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইলাম। গত ইমাসের মধ্যে সে রেবার খোঁজ লয় নাই! ইহাতে আমি নিদারুণ ঃসংবাদ আশঙ্কা করিতাম, যদি নার্সের মুখে মৃদু হাসিটি না াকিত।

নার্স স্বরটা বিশেষ রকম মিষ্টি করিয়া বলিল, "রেবাতাঈ—সেই ৯।২০ বছরের মেয়েটি নয়? গৌর বর্ণ, লেখাপড়া জানা, নয় কি?"

আমরা উভয়েই মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম।

নার্স আরও মিঠা স্বরে বলিল, "সে তো দুমাস আগেই আরোগ্য ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে গেচে।" বলিয়া আবার হাসিমুখে, তীক্ষ্ণ কুটিল ষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম, "সে এখন কোথায় আছে বল্‌তে পারেন?"

নার্স ঠোঁট উল্টাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া, একটু দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলিল,

"তা আমি কি ক'রে বল্‌ব? রোগী আরাম হয়ে গেলে তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি?"

আমি ক্ষুণ্ণ মনে সিঁড়ির দিকে চলিলাম। দামুও চলিল। নার্স আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "লিফ্‌ট্‌ সুরু হয়েছে, তা দিয়েই এখন নামতে পারেন।"

তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, শুধু এই খবরটি দিতেই আমাদিগকে ডাকে নাই। আরও যেন কিছু বলিবার ছিল।

আমি অন্যমনস্কভাবে ক্ষণেক দাঁড়াইলাম। নার্স একটু অগ্রসর হইয়া চাপা স্বরে দামুকে বলিল, "আপনি তার ভাই?" দামু মাথা নাড়িল।

নার্স বলিল, "আপনি ডাক্তার সাহেবকে আপনার বোনের কথা জিজ্ঞাসা করুন না কেন?"

আমি ফিরিয়া বলিলাম, "ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর ঠিকানা কি?"

নার্স বলিল, "শান্তি-কটেজ, মালাবার হিল।" একথা বলিয়া যেন অপরাধীর মত সে ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল।

আমি লিফ্‌টের বোতাম টিপিলাম। নীচে নামিয়াই একখানা ট্যাক্‌সি ডাকিলাম। পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে মালাবার হিলের 'শান্তি-কটেজের' সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সুন্দর সৌখিন বাড়ী। দরজায় জানালায় সুদৃশ্য পর্দা। দেয়ালের কোণ ছাইয়া আইভি-লতা উঠিয়াছে।

দামু ট্যাক্‌সি হইতে নামিল। তাহাকে বলিলাম, "ডাক্তার সাহেব বাড়ীতে থাক্‌লে আমাকে ডেকো।"

দামু ফটকের কাছে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। একজন মধ্য-বয়স্ক ভদ্রলোক কোণের ঘর হইতে সম্মুখের ঘরে গেলেন। দামু মুখ ফিরাইয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল, 'এই ডাক্তার।' আমি স্থির দৃষ্টিতে

সেদিকে চাহিয়া রহিলাম। মিনিট খানেক পরে বাড়ীর সম্মুখের ঘর হইতে অর্গ্যানে একটা কোমল গৎ বাজিয়া গেল—যেন পরিচিত, সুদূর অতীতের স্মৃতি-জড়িত। পরক্ষণেই তার সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিল।…বাঙ্গলা গান!…রেবার কণ্ঠস্বর! আরবের মরুভূমির মধ্যে শুনিলেও আমি বলিতে পারিতাম, এ রেবার স্বর! সেই সুরের ঢেউ, যাহা আমি দিনের পর দিন নির্জ্জন অপরাহ্নে কৃষ্ণসদনে বসিয়া বহাইয়া দিয়াছিলাম।

দামোদর আমার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "রেবা!" আমি স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ কে যেন একটা জ্বলন্ত লৌহ-শলাকা আনিয়া আমার বক্ষস্থলে বিঁধাইয়া দিল। কে যেন আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিতে লাগিল। সে গানের সুর যতই উচ্চে উঠিতে লাগিল, ততই আমার কানের ভিতর যেন তপ্ত সীসা গলিয়া পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ গান থামিল। বোধ হয় বাড়ীর সাম্‌নে মোটর দেখিয়া, ডাক্তার বাহিরে আসিল। তাহার পিছনে আসিল জরিওয়ালা শাড়ী-পরা একজন মহিলা…রেবা! সেই পোষাক হইতে যেন তীব্র একটা জ্বালা বাহির হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দামোদর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল, আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলাম, "চল"। "ট্যাক্‌সিতে বসিয়া আমি কি একটা প্রেরণার বশে শুধু বার বার তাহাকে বলিতে লাগিলাম, "জোরে চল, জোরে চল।"

গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীতে উঠিবার সময় পকেট হইতে চন্দনের বাক্সটা বাহির করিয়া পায়ে পিষিয়া চূর্ণ করিলাম।

ঘরে আসিয়া তপ্ত কণ্টকিত শয্যায় আশ্রয় লইলাম। চিত্ত দারুণ

বিদ্রোহে বলিয়া উঠিল, "এই আমার প্রাণভরা ভালবাসার প্রতিদান! অর্থের মোহে, বিলাসের মোহে আজ এই অধঃপাত!" দেহের ভিতর দিয়া আগুনের হল্‌কা বহিয়া যাইতে লাগিল। তীব্র বেদনায় অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ভ্রষ্টা! পতিতা! পাপমগ্না!··· আমার রেবা, যাহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, সে আজ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া এক পরপুরুষের আশ্রয় লইয়াছে! এত বড় একটা অনিয়ম, এতবড় একটা পাপ, এত সহজে শান্তভাবে জগতে গৃহীত হইবে?"

ডাক্তারের প্রতি দারুণ বৈরিভাব জাগিল। ভাবিলাম, সে নীচ, কাপুরুষ; নিরাশ্রয়া বালিকাকে হরণ করিয়াছে। চিকিৎসাধীনা রোগিণীকে অসৎপথে লইয়া গিয়া নিজ ব্যবসায়ের নীতিবিরুদ্ধ, আইন-বিরুদ্ধ, কাজ করিয়াছে। তাহাকে ফৌজদারিতে দেওয়া যাইতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে মন একটা দুরন্ত সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিল। স্থির করিলাম, পরদিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিব, তাহাকে তাহার unprofessional conduct (ব্যবসায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার)-এর কথা, নীচতার কথা বলিব। আমি রেবার fiance—ভাবী স্বামী—এ ক্ষমতায় তাহাকে ফিরাইয়া চাহিব। যদি দেয়, ভাল; না দিলে···

বিছানা হইতে উঠিয়া সুইচ টিপিলাম। কোট হইতে চাবি লইয়া একটি পুরাতন ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহার নীচে হইতে আমার মেসোপোটেমিয়া বাসকালের সঙ্গী রিভলভারটিকে বাহির করিলাম। গুলির পাউচ খুলিয়া তাহার ছয়টি চেম্বারই পূর্ণ করিয়া রাখিলাম।

যখন বিছানায় শুইতে গেলাম তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছে। হঠাৎ মনে হইল, যদি ডাক্তার নির্ব্বিবাদে রেবাকে আমার সঙ্গে দিয়া দেয়, তবে?

ক্ষণেকের জন্য চিত্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। মনের কোণ হইতে কে বলিল, "ঐ কলুষিত দেহ-মন কি কোনও দিন সুন্দর গৃহ রচনা করিতে পারিবে ?" যেমনভাবে আমি সে সন্ধ্যায় চন্দনের বাক্সটিকে পিষিয়া গুঁড়া করিয়াছিলাম, এখন তেমনিভাবে যেন কে আমার হৃদয়কে পিষ্ট, দলিত করিতে লাগিল।

কিন্তু সহসা কোথা হইতে একটা প্রবল তেজস্বিতা আসিয়া চিত্ত দখল করিয়া বসিল। উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "আমার মত একটা লোক না হয় বিশ্ব হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। আমার সমস্ত রকমের সুখ-শান্তি জলাঞ্জলি দিয়া, সহস্র প্রকার যাতনাকে বরণ করিয়াও, যদি ঐ সুন্দর তরুণ জীবনটিকে শুভের পথে, শুদ্ধির পথে, ফিরাইয়া আনিতে পারি, তবে এ জীবন সার্থক হইবে।"

২৪

পরদিন আফিসে ডাইরেক্টরী দেখিয়া ডাঃ নেরলকরের টেলিফোনের নম্বর বাহির করিয়া ফোন করিলাম। ডাক্তার স্বয়ং জবাব দিলেন। আমি বলিলাম, কোনও বিশেষ কাজে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তিনি বিকালে সাড়ে চারটায় সময় দিলেন।

ঠিক সাড়ে চারটায়—এক আধ মিনিট আগেও হইতে পারে—তাঁহার ঘরের দরজায় গিয়া কার্ড পাঠাইলাম। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন। ভিতরে যাইতেই অভিবাদন করিয়া বসাইলেন। বাঙ্গালী দেখিয়া একটু কৌতূহলী হইয়াছেন, মনে হইল।

আমি বলিলাম, আমি চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ে আসি নাই, কোনও প্রাইভেট বিষয়ে আলাপ করিতে আসিয়াছি।

তিনি উৎসুক হইয়া বলিলেন, "কি, বলুন।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আড়াই মাস আগে

আপনার হস্পিটালে রেবাতাঙ্গ ফড্‌নীস ব'লে একজন রোগিণী ছিল।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনি তার কেউ হন?"

আমি বলিলাম,—কতকটা ইতস্ততঃ ভাবে,—"আমি তার ভাইয়ের বন্ধু,—তাদের পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।"

"বটে? আপনারা আপনাদের আত্মীয়া সম্বন্ধে তো খুব যত্নশীল! আড়াই মাস পরে রোগিণীর খোঁজ করতে এসেচেন।" বলিয়া ডাক্তার উঠিলেন, পাশের আলমারী খুলিয়া একখানা খবরের কাগজ বাহির করিলেন এবং তাহা আমার সম্মুখে টেবিলের উপর বিছাইয়া, আঙ্গুল দিয়া একটা জায়গা দেখাইয়া দিলেন।

আমি পড়িলাম—

সমাজ সংস্কার

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ডাঃ এম, সি, নেরলকর এম, বি, বি, এস; এল, আর, সি, পি, এস ও মিস্ রেবা তাঙ্গ ফড্‌নীসের বিবাহ খুব সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ নেরলকর বম্বেতে প্রথিতনামা চিকিৎসক, জাতিতে ব্রাহ্মণ, প্রথম বিবাহ গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সমাজে করিয়াছিলেন। মিস্ ফড্‌নীস জাতিতে সারস্বত, কলেজে শিক্ষিতা। বিবাহ সিভিল ম্যারেজ আইন অনুসারে হইয়াছে। ডাক্তার সাহেবের সমব্যবসায়ী ও অপর বহু বন্ধু বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খবরের দুইপাশে দম্পতীর ছবি ছিল।

আমি স্থির দৃষ্টিতে সে ছবি দুইখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ইতিমধ্যে ডাক্তার পাশের দরজায় গিয়া ডাকিলেন, "রেবা!" এবং দরজা কতক খুলিয়া ভিতরে মুখ লইয়া মারাঠীতে বলিলেন, "তোমার একজন আত্মীয় এসেচেন, দেখবে এসো।"

ডাক্তার চেয়ারে আসিয়া বসিলে বলিলাম, "আচ্ছা, এ ব্যাপারে মেয়ের আত্মীয়-স্বজনকে, অভিভাবককে খবর দেওয়া উচিত ছিল না ?"

বলামাত্রই ডাক্তার বলিলেন, "আত্মীয়-স্বজন ! অভিভাবক ! প্রথম কথা, মেয়ে সাবালিকা ছিল, নিজের মত নিজেই গঠন করতে পারত; দ্বিতীয়তঃ, মেয়ের অসুখের সময় আত্মীয়-স্বজনদের তো কোথাও দেখা যায় নি ;—যাকে তার অভিভাবক বলচেন—সে তো তার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হয় নি। সে যদি নিমন্ত্রণ পাবার উপযুক্ত হ'ত তবে নিশ্চয়ই পেত।"

এমন সময় দরজা খুলিয়া রেবা আসিল। চোখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিল। তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি চাহিতে তাহার চোখের পাতা দুটি ঈষৎ নমিত হইল,—হয়ত সঙ্কোচে, হয়ত লজ্জায়, হয়ত অভিমানে,—হয়ত বা অহঙ্কারে। দেহ তার একটুকুও নড়িল না। হাত দিয়া পরনের শাড়ীটিকে কিঞ্চিৎ গুছাইয়া লইল। মুখে স্থির গাম্ভীর্য্য। যেন সামনে কিছু দেখিতেছে না। অথবা যাহা দেখিতেছে তাহা অর্থশূন্য। যেন আমি চিরকালের অপরিচিত। আমাকে চেনে না, জানে না; আমাকে জীবনে কোনওদিন দেখে নাই।

ডাক্তার বলিলেন, "এঁকে চিনতে পারছ ?"

রেবা বলিল, "হ্যাঁ।" বলিয়া স্থির, নিশ্চল, প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে দেহভঙ্গীতে দৃঢ়তা ছিল না, কমনীয়তাও ছিল না; সে দৃষ্টিতে দম্ভ ছিল না, যাচ্ঞাও ছিল না! সে চেহারায় যেন একটা গূঢ়, জটিল, অনির্দ্দেশ্য প্রহেলিকা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ছিল, যাহা মানুষের বুদ্ধির অগম্য, অবোধ্য।

আমি মুখোমুখি হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে অপ্রস্তুত হইল না, অপ্রতিভ হইল না। ঈষৎ নমিত চক্ষু তুলিল, কিন্তু সে দৃষ্টির ভিতর নূতন কোনও অর্থ ফুটিয়া উঠিল না।

মুহূর্ত্তের তরে আমি ভাবিলাম, "মিস্ ফড়্নীস! জাতিতে সারস্বত!" কিন্তু পরক্ষণেই আমার সমস্ত আত্মসম্মান সঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং স্থির গম্ভীরকণ্ঠে বলিলাম, "ডাক্তার সাহেব, আমি আপনাকে, আপনাদের দুজনকে, অভিনন্দন করছি।"

ডাক্তার স্মিত মুখে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন, "ধন্যবাদ"।

রেবার দিকে চাহিয়া মাথা নোওয়াইলাম। রেবা ঈষৎ মাথা নোওয়াইল। আমি চলিয়া আসিলাম।

রাস্তায় চলিবার সময় অনুভব করিতেছিলাম, পকেটের রিভলভারটি যেন তাহার গুরুভার দ্বারা আমাকে টানিয়া মাটির দিকে নোওয়াইতে চাহিতেছে।

২৫

সেদিন সন্ধ্যায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে আর স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়াইব না।

মেসোপোটেমিয়ায় আমি বেতারের কাজ শিখিয়াছিলাম। দুই সপ্তাহ পরে এ জাহাজে কাজ লইয়া বম্বে ছাড়িয়া চলিয়া আসি।

কিন্তু আসিয়া অবধি এক এক সন্ধ্যায়, এক এক নীরব রাত্রে, আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে—কিন্তু আমি তাহার ঠিক উত্তর খুঁজিয়া পাই না। প্রশ্নটি এই,—রেবা যে ডাক্তারকে বিবাহ করিল তাহা প্রকৃত ইচ্ছায়, না দামুর শ্লেষ-বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া, আমার উপর অভিমান করিয়া?

আমি কল্পনায় বারবার সেই শেষ-দেখা মূর্ত্তিটি চোখের সামনে তুলিয়া ধরি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করি, আর ভাবি, তাহার মধ্যে কি আমার প্রতি ভালবাসার কোনও চিহ্ন ছিল ? বিদায়ের সময় আমি যখন মাথা নোওয়াই, তখন তাহার মাথা নোওয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখদুটি কি কিঞ্চিৎ ছল-ছল করিয়া উঠিয়াছিল ?

রেবা কি তবে আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসিয়াছিল ?

আমি আজ প্রায় এক বৎসর যাবৎ সমুদ্রের উপরেই বাস করিতেছি। বম্বেকে ভুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সমুদ্রের কলনাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার প্রাণের ভিতর বম্বের ডাক ছুটিয়া আসে। জাগরণে, স্বপ্নে, এক একবার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের সেই ছোট দ্বীপটি, তার সেই শ্রেণীবদ্ধ বিরাট্ অট্টালিকারাশি ; তার সাগরকূল, বন্দর, জনবহুল রাস্তা ; তার জীবনের বৈচিত্র্য, আর আমার প্রাণের অন্তস্তলে তার নিবিড় একটুকু স্পর্শ !

উপসংহার

রমেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাসময়ী কাহিনী যখন একটি জটিল প্রশ্নে আসিয়া সমাপ্ত হইল ও জলরাশির মাঝখানে এক নগরের মনোরম চিত্র গড়িয়া তুলিল, তখন অদূরে সিঙ্গাপুরের নীল বেলাভূমি দেখা দিয়াছে। আমি নীরবে সে তরুণ প্রাণের বেদনার গভীরত্ব অনুভব করিলাম, নীরবে তাহার হাতদুটি আমার হাতে লইয়া সস্নেহে বিদায় লইলাম।

যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে আমাদের বম্বে আফিসের ঠিকানা দিয়া বলিলাম, যদি সে কখনও বম্বে যায়, তবে যেন নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করে।

সেই আমার শেষ সিঙ্গাপুর প্রবাস। ফিরিবার পথে আমি এক অষ্ট্রেলিয়ান জাহাজে গেলাম। কিন্তু সারাপথ সেই বেতারযন্ত্রচালক সুদর্শন বাঙ্গালী যুবকের কথা মনে পড়িতেছিল।

* * * * *

এবার হঠাৎ বম্বেতে তাহার সঙ্গে দেখা হইল। সে আমাদের আফিসে আসিয়াছিল। আমি তো প্রথম তাহাকে চিনিতেই পারিলাম না। তাহার সৌখিন ইংরেজী পোষাকের বদলে পরিধানে ছিল খদ্দরের জামা আর ধুতি। চেহারায় আগেকার সেই বিষাদমাখা কমনীয়তা ছিল না, তাহার পরিবর্ত্তে কেমন একটা দৃঢ় তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আমি তাহাকে আমার বসিবার ঘরে আনিয়া সব খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "আপনি বম্বের মায়া এড়াতে পারলেন না, শেষ পর্য্যন্ত !"

রমেন একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা পারি নি সত্য। আমি আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেচি।"

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "সে মেয়েটির সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েচে ?"

রমেন বলিল, "হয়েচে। রেবা একজন 'কেসরিয়া', 'দেশ-সেবিকা'। কাল তিন মাসের জন্য জেলে গেচে। আমিও দু-সপ্তাহ পূর্ব্বে চার মাসের জেল খেটে এসেচি ?"

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, "বটে ?"

রমেন বলিল, "হয়ত এ সপ্তাহের মধ্যে আমায় আবার যেতে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের দুজনের মধ্যে আবার মিল হয়েচে, নিশ্চয় ?"

রমেন একটু থামিয়া, গম্ভীরভাবে বলিল, "বম্বে আমাকে টেনে এনেছিল ভালবাসার মোহে। এসে দেখলাম, ভালবাসার চেয়ে আরও বড় একটা কিছু আছে।"

আমি বলিলাম, "সে কি ?"

রমেন বলিল, "আত্মাহুতি। আজ রেবাকে আমি ভালবাসি না, রেবাও আমাকে ভালবাসে না ; উভয়ে আসক্ত একটা তৃতীয় জিনিষে। হয়ত তার ভিতর দিয়ে আমাদের জীবন পূর্ণতর সার্থকতা লাভ করবে।"

আমি শুধু বিস্মিত দৃষ্টিতে যুবকের উজ্জ্বল, প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তিন সপ্তাহ



পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র কিষাণপুর শহর, মারাঠাদের দেশ। কিষাণপুরে সেবার প্লেগের প্রকোপ ছিল। শহর ছাড়িয়া সকলে বাহিরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। কেহ নদীর ওপারের নির্সী গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল, কেহ বা আরও দূরে সিংপুরে গেল। গরীবেরা শহরের বাহিরে পাহাড়ের নীচে কুটীর বাঁধিয়া রহিল।

সকাল সন্ধ্যায় বহু লোকজন কিষাণপুরে যাতায়াত করে, সেজন্য যেখানে প্রাণের ভয়, সেখানেই আবার গতির আনন্দ। স্কুলের ছেলেরা বইয়ের ব্যাগ হাতে লইয়া রেলের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আনন্দে ছুটাছুটি করিতে থাকে। বৃদ্ধ নির্সীকর, যিনি আজীবন সমাজকে পরিহার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি—তাঁহাকেও ট্রেনে বসিয়া দুকথা গল্প করিতে হয়, দুচারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

ছোট্ট 'মীটার-গেজ' লাইনের উপর দিয়া ট্রেনখানা সবুজ পাহাড়ের বুক বাহিয়া আসা-যাওয়া করে। কিষাণপুর ছাড়িয়া প্রথম আট মাইল

পর্য্যন্ত দুদিকে জোয়ারী ও চিনেবাদামের ক্ষেত, তারপর পঞ্চগঙ্গা নদী, তার উপর পুল। পুলের নীচে দেখা যায় নদীর জলে কেহ স্নান করিতেছে, কেহ কলসী ভরিয়া জল ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। অপর পাড়ে লম্বা ঘাসের পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বক সারি বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

পুল ছাড়াইয়া এক মাইল পরে ছোট্ট নির্সী ষ্টেশন; গাঁ থেকে আধ মাইল দূরে। প্ল্যাটফর্ম্মের পাশে দুটি ম্যালানটোলিয়া গাছ হইতে শাদা সুগন্ধি ফুল পাথরে বাঁধানো জমিনের উপর বিছাইয়া থাকে। এক বৃদ্ধ অতি পুরাণো একটি ঝুড়ি হাতে লইয়া কখনও ভুট্টা, কখনও বা আতা অথবা শশা ফেরি করিতে থাকে। দুধের ব্যাপারীর মজুরেরা বড় বড় খালি ভাণ্ডসহ নামিয়া পড়ে, সেগুলি ভারে লাগানো শিকা হইতে ঝুলাইতে ঝুলাইতে গ্রামের দিকে চলিয়া যায়। সন্ধ্যার গাড়ী হইতে নামিয়া "প্লেগের যাত্রীরা" যে যার ছোট বড় পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া কেহ গ্রামের দিকে, কেহ বা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করে। অন্ধকার রাতে সে পাহাড়ের তলার মাঠের উপর বহু আলো ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে। হঠাৎ দেখিলে, পূর্ব্ববঙ্গের কোনও বড় হাটের পাশের নৌকায়-ভরা নদী বলিয়া ভ্রম হয়।

নির্সী হইতে সিংপুর আরও ষোল মাইলের পথ। প্রথম চার মাইল অতি উর্ব্বর জমির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। দুদিকে আক, তামাক, মরিচ প্রভৃতি ফসল দেখা যায়। পঞ্চম মাইল হইতে গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে থাকে। এঞ্জিন 'লো গিয়ারে' চালান হয়, ঝক্ ঝক্ শব্দ করিতে করিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ে চড়ে। যতই উপরে ওঠা যায়, ততই পাশের জোয়ারী গাছের উচ্চতা কমিয়া আসে, পাতার গাঢ় সবুজ রং ফিকে হইয়া পড়ে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিলে শুধু সামান্য ঘাস পাওয়া যায়, তাহাও যেন কোন রকমে বাঁচিয়া রহিয়াছে। চূড়া ছাড়িয়া

গাড়ীখানা আবার কতক নীচে নামিয়া আসে, আবার দুই দিকে জোয়ারী ক্ষেত মাথা তুলিয়া উঠে এবং তার পরেই দেখা যায়, লাল টালি-ঢাকা ছোট ছোট বাংলা, দুচারটা তেলের কলের চিমনি, আর সরল কয়েকটা রাস্তা। এ-ই সিংপুর।

সেবার অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে সিংপুর ও কিষাণপুরের মধ্যে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিতে হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্বের আকর্ষণে কিষাণপুর আসিয়াছিলাম, আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম অধ্যাপকের পরিচয়ে এক মারাঠা ভদ্রলোকের। আসিবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই হঠাৎ প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল। ভদ্রলোক কিষাণপুর ছাড়িয়া সিংপুরে বাড়ী লইলেন, আমিও সেই সঙ্গে সিংপুরে গেলাম। তাম্রলিপি ও শিলালিপির পাঠোদ্ধারে এত মশ্‌গুল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কোনও রকমে তিনটি সপ্তাহ কাটাইয়া কাজ শেষ করিয়া যাইব, একথা ভাবিয়া রহিয়া গিয়াছিলাম।

অবশ্য যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম তাঁহার অতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও সে ব্যবস্থার একটা প্রধান কারণ ছিল। তিনি জাতিতে ছিলেন "মারাঠা", বয়সে প্রৌঢ়, বিদ্যায় আমেরিকা-ফেরত এঞ্জিনিয়ার এবং পেশায় কন্ট্রাক্টর। শহরে বড় বড় দালান-ইমারত তৈরী করিতেন। তাঁহার পদবী ছিল দেশাই, নাম শ্রীধর, তার সঙ্গে পিতার নাম সখারাম যোগ করিয়া পুরা নাম লিখিতেন। তবে লোকে তাঁহাকে "বাবুরাও" বলিয়া ডাকিত। আমিও দুই একদিন মিঃ দেশাই বলিয়া পরে "বাবুরাও"ই বলিতাম।

বাবুরাও যে আমাকে শুধু আমার অধ্যাপকের পরিচয়ে খাতির করিতেন, তাহা নহে। তার আর একটা কারণ ছিল। আমি যেদিন কিষাণপুরে আসিয়াছিলাম, সেদিন তিনি আমাকে আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া

উঠিলেন, "আপনার নাম চক্রবর্ত্তী? তা' হ'লে আপনি বাঙালী? নয় কি?"

আমি সে-কথা স্বীকার করিলাম।

বাবুরাও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন, "বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি মিত্রের সঙ্গে আমেরিকাতে আমি বহুকাল একত্র বাস করেচি, তাঁরা আমার ভাইয়ের মত হ'য়ে গেছ্‌লেন। রায়কে আমরা 'দাদা' বলে ডাকতাম।"

এ খবরে আমি আনন্দ জ্ঞাপন করিলাম।

বাবুরাও উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "সুকুমার রায়ের বাড়ী ত্রিপুরা আর দাশরথি মিত্রের বাড়ী হুগলী জেলায়। আপনি তাঁদের চেনেন কি?"

তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই জানিয়া বাবুরাও নিরাশ হইলেন। বলিলেন, রায় ব্রাহ্মণ ছিলেন, চক্রবর্ত্তীও ব্রাহ্মণ, তাই আশা করিয়াছিলেন কোনও রকমে বা আমাদের জানাশোনাও থাকিতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন তাঁরা আমেরিকায় ছিলেন?"

বাবুরাও বলিলেন, "আমরা তিনজনে একত্রে নিউইয়র্কে ছিলাম ১৯০৭ সালের জানুয়ারী হ'তে ১৯০৮এর মে পর্য্যন্ত। ব্রডওয়ের ওপর আমাদের বাড়ী ছিল।"

বাবুরাওয়ের সেই বাঙালী বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকুক আর নাই থাকুক, আমি যে তাঁহাদের স্বজাতি সে-বিষয়ে তো ভুল নাই! তাই বাবুরাও আমাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পরিবার ছিল না, তিনি নিজেই সব খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করিতেন। রসুয়েকে দিয়া আমার জন্য নানা রকমের বাংলা খাদ্য তৈরি করাইতেন ও তাহা বাংলা দেশের মতই হইয়াছে জানিলে খুব খুসি হইতেন।

সেই পাহাড়ে রাস্তার উপর দিয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ডেলী প্যাসেঞ্জারী করার স্মৃতি এখনও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। বাবুরাও প্রায়ই দুপুরের গাড়ীতে যাইতেন। আমি সকালে নয়টায় সিংপুরে গাড়ীতে চড়িতাম। ছোট্ট সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীখানা সে সময় সাধারণতঃ খালি থাকিত। তাহার দেওয়ালের দুই পাশে দুইটি ছবি ছিল; একটি, গোয়ার নিকটস্থ ক্যাসল্‌রক পাহাড়ের, তাহার গা বহিয়া দুধসাগর জল-প্রপাত ধাপে ধাপে নীচে পড়িতেছে; আর একটা ভিজেগাপটমের বন্দরের। যখন আমার দৃষ্টি গাড়ীর ভিতরে থাকিত, তখন ঐ ছবি দুটির দিকে চাহিতাম; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই চক্ষু বাহিরের উন্মুক্ত আকাশ, মাঠ আর দূরের ধোঁয়াটে পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে ডুবিয়া থাকিত।

মাঝে মাঝে আমার সহযাত্রী হইতেন রেলের কর্ম্মচারীরা। কেহ রোড-ইন্‌স্পেক্টার; সঙ্গে পিছনের ব্রেকে ট্রলি থাকিত, পাশের থার্ডক্লাসে তাঁহার লোকজন থাকিত। তিনি মাঝের ষ্টেশনে নামিয়া যাইতেন। জাহাজের তুলনায় যেমন ডিঙি, তেমনি ট্রেনের তুলনায় এ ছোট ট্রলিখানা। তিনি ইহার উপর বসিয়া তীরবেগে লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেন।

কেহ আফিস-ইন্‌স্পেক্টর, সঙ্গে বাক্‌সভরা কাগজপত্র থাকিত, কোনোটাতে সহি করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের হাতে ছাড়িয়া দিতেন, কোনোটাতে বা ষ্টেশন মাষ্টারের সহি লইয়া বাক্সে পুরিতেন।

কেহ বা ডাক্তার, সঙ্গে ঔষধের পেটরা, শিশি, বোতল। তাঁহার কাছে জ্বরে রক্তচক্ষু কেরাণী আসিত, টিকেট-চেকার আসিত, পোর্টার আসিত; তিনি তাঁহার বোতল হইতে মিক্শ্চার খানিকটা করিয়া ঢালিয়া দিতেন, ছোট একটা শিশি হইতে শাদা শাদা বড়ি বাহির করিয়া দিতেন,

আর কাহাকেও ইংরেজীতে, কাহাকেও মারাঠীতে, কাহাকেও কাণাড়ীতে এবং এক আধজনকে হিন্দুস্থানীতে ঔষধের সেবনবিধি বলিয়া দিতেন।

যখন গাড়ীখানা ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিত, তখন রোড-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার ট্রলির কথা ভুলিয়া যাইতেন। আফিস-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার সহি করিবার কাজ স্থগিত রাখিতেন, ও ডাক্তারের মনের ভিতর চিকিৎসা-বিষয়ক ও বহু ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান চাপা পড়িয়া যাইত। তাঁহারা হঠাৎ সহজ সামাজিক মানুষ হইয়া যাইতেন। আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ জমিয়া উঠিত। ব্রাহ্মণ রোড-ইন্‌স্পেক্টার রিট্রেঞ্চমেণ্টের তীব্র নিন্দা করিতেন, জৈন ডাক্তার তাঁহার যুদ্ধকালীন পূর্ব্ব-আফ্রিকা-প্রবাসের গল্প বলিতেন, আর বৃদ্ধ ইউরেশিয়ান আফিস-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার ছেলেবেলার স্কুল-জীবন ও ক্যাথলিক ছাত্রদের প্রতি প্রোটেষ্টাণ্ট শিক্ষকদের বদ্ নজর হইতে আরম্ভ করিয়া, কলিকাতা-প্রবাস ও লণ্ডন দর্শনের কাহিনীতে আসিয়া থামিতেন। ওসব কথা শুনিতে শুনিতে মাইলের পর মাইল অতি সহজে কাটিয়া যাইত।

সিংপুরের পরের ষ্টেশন কনঙ্‌লেতে গাড়ী একটু বেশীক্ষণ থামিত। এখানে ট্রেনের ক্ষুদ্র এঞ্জিনটিতে জল ভরা হইত, এবং কিষাণপুরের গাড়ীর সহিত আমাদের গাড়ীর ক্রসিং হইত। আমি কৌতূহলের সহিত যাত্রীদের উঠা-নামা দেখিতাম। ফর্সা, হাল্কা, চোখা নাক-চোখ-ওয়ালা চিতপাবন ব্রাহ্মণ; কালো, দিঘ্‌লে, লাল্‌চে চোখওয়ালা কাণাড়ী লিঙ্গায়ত; কাছাপরা মেয়েমানুষ,—ঘোমটাহীন ব্রাহ্মণী, কপালের গোড়া পর্য্যন্ত ঘোমটা-পরা অব্রাহ্মণ মেয়েরা; বুক পর্য্যন্ত ওড়না দিয়ে ঢাকা, ঘাগরা-পরা মারবাড়ী বধূ; সর্ব্বাঙ্গ বুরখা দিয়া আবৃত মুস্‌লিম্ মহিলা;—এল্লামা সম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রীবেশী পুরুষ, চোখের দৃঢ়তা ও শাড়ীর ভিতর দেহের

কঠিনতা তাহাদের পুরুষত্ব ঘোষণা করিত ;—এরকম সব চলচ্চিত্র চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইত।

গাড়ী নির্সীতে আসিলে "প্লেগের যাত্রীতে" কামরাখানা ভরিয়া যাইত। বৃদ্ধ নির্সীকর বাঁদিকের বাঙ্কের কোণ চাপিয়া বসিতেন, বিশাল-কায় দুই জোশী ভ্রাতা দুই বাঙ্কের মাঝের জায়গা জুড়িয়া বসিতেন। জ্যেষ্ঠ ভাউ-সাহেবের দিল-খোলা হাসি গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দকে ছাড়াইয়া আমোদের হল্লা তুলিত। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কথা উঠিত, ভাউ-সাহেবের দিকটায় গাড়ীটা যেন একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, 'ডি-রেল' হইবার আশঙ্কা! কথা আরম্ভ করিতেন, অপর কোণ হইতে, বেঁটে, ছিপ-ছিপে, মাথায় কায়দা করে পাগড়ী আঁটা, পাটনে রাও-সাহেব। তিনি রাজদরবারে চাকরি করিতেন, তাই তাঁহার রাও-সাহেব পদবী! তাঁহার কথার উত্তরে ভাউ-সাহেব প্রথম খুব এক চোট হাসিতেন।

রোজ রেল ভ্রমণের এই আধ ঘণ্টাকাল খুব সোরগোলে কাটিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির চর্চ্চা হইত,—নেতাদের তুলনামূলক সমালোচনা হইত, সঙ্গে সঙ্গে তুকারামের অভঙ্গ, বিবেকানন্দের বাণী ও মহাত্মার বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হইত। কিন্তু হঠাৎ এক একবার সমস্ত যুক্তি-তর্ক আলোচনা আড়ষ্ট হইয়া পড়িত—কিষাণপুরের প্লেগের বিবরণে। প্লেগ সম্বন্ধে নানারকম খবর আনিতেন তাতা-সাহেব উদ্‌গাওকর। তিনি বয়সে নবীন, তবে এখনই বংশানুক্রমে আগত মস্ত সোনা-জহরতের ব্যবসার মালিক ও চালক হইয়াছেন। তাহার ফর্সা, পীতাভ রং, মুখে কতকটা মোঙ্গলীয় ছাঁচ। তিনি তাঁহার চোখ কপালে তুলিয়া প্লেগের প্রসার বিষয়ে নানা রোমাঞ্চকর খবর দিতেন। 'গত কাল তেরটা কেস হয়েচে, তার মধ্যে সাতটাই মারা গেচে, আজকের কেসের সংখ্যা তার দ্বিগুণ'; 'পাশের আতীগ্র গ্রামে ইঁদুর পড়তে সুরু হয়েচে, শীঘ্র

নিসীতেও ইঁদুর পড়বে, তখন প্লেগের ক্যাম্প ভাঙতে হবে', ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই দিনের পর দিন পাহাড়ের উপর দিয়া রেল-ভ্রমণ, নানা লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, যাত্রীদের চঞ্চলতা,—এসব আজ সুদূর কলিকাতায় বসিয়াও মনের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এখনও সেই গাড়ীর চাকার ও রেলের ঘর্ষণজাত ইস্পাতের গন্ধ কল্পনায় অনুভব করিতে পারি।

২

সিংপুর হইতে কিষাণপুর যাইবার পথে কোনও কোনও দিন বাবুরাও আমার সঙ্গী হইতেন। আসিবার পথে সপ্তাহে দুইদিন উভয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিতাম, অপর তিনদিন আমি বিকালের গাড়ীতে চলিয়া আসিতাম। উভয়ে যখন গাড়ীতে একা বসিয়া থাকিতাম তখন প্রায়ই বাবুরাও অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিউইয়র্কে দুই বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার দেড় বৎসরের জীবন-যাত্রার কাহিনী বলিতেন। তাঁহারা কেমন করিয়া বাঙালী ধরণে মাছ রান্না করিতেন (তাঁহাদের কাছেই তিনি বাংলা রান্না শিখিয়াছেন), কেমন সুন্দর বাংলা গান গাহিতেন, তাঁহার অসুখের সময় কিরূপ প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন, এসব কথা তিনি অতি অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন বলিয়া যাইতেন।

সেই আমেরিকা-প্রবাসী বাঙালীর স্বজাতি বলিয়া আমি বাবুরাওয়ের নিকট-আত্মীয় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু বাবুরাও আমাকে আকৃষ্ট করিলেন, তাঁহার কর্ম্মময় প্র্যাক্টিকাল জীবন দিয়া। আমি থাকিতাম শুধু অতীত লইয়া।

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
বিক্রমাদিত্যের ক'টা ছিল নাতী,

এ রকম সব তথ্য বাহির করিয়া বিদ্যা জাহির করা, এবং পরিণামে ইউনিভার্সিটি হইতে চরম ডিগ্রি লাভ করা, ইহাই ছিল আমার তখনকার জীবনের উদ্দেশ্য। বাবুরাও বাস করিতেন বর্ত্তমানে, বাস্তব জগতের ভিতরে—তাই তাঁহার চালচলন আমার কাছে ভারি কৌতুকপ্রদ মনে হইত। প্রত্যেক ষ্টেশনেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে লোকজন আসিত; কোথাও মিস্ত্রী, কোথাও রাজ, কোথাও মোষের গাড়ীওয়ালা, কোথাও দোকানদার অথবা ঠিকাদার। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা এক একটা কাজের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। তার ফলে কোথাও পাথর কাটা হইত, কোথাও সে পাথর গাড়ীতে উঠিত, কোথাও দেয়াল তোলা হইত, কোথাও বা ছাত লাগিত। কিষাণপুর ষ্টেশনে প্রায়ই তাঁহার কাছে একজন ক্ষীণকায়, তীক্ষ্ণ-চক্ষু মিস্ত্রী আসিত. তাহার বাঁ হাতে থাকিত একটা অস্ত্রের বাক্স, আর ডান হাতে ফুট-রুল; তাহাতে আর বাবুরাওয়েতে বর্গফুট ঘনফুটের মৌখিক আলাপ চলিত। মিস্ত্রীর মুখ কালো হইয়া পড়িত, চক্ষু হঠাৎ স্থির হইয়া আসিত, তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে টাকায় আনায় পাইয়ে হিসাব গুণিয়া বাহির করিত। এক এক সময় একা একা গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতাম, যেসব প্রাচীন দক্ষিণী রাজাদের বংশতালিকা সংগ্রহ করিবার জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, তাহাদের কেহ ঐ মিস্ত্রীটির মত সদ্ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন কি, না শুধু পরের শ্রমলব্ধ অর্থ লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়া, পাথরে ও তাম্রপত্রে নিজেদের গৌরব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রোজই ষ্টেশনে আসা-যাওয়ার জন্য কিষাণপুরে আমার কাছে বাবুরাওয়ের গাড়ী আসিত। তাঁহার অতি পুরাণো একখানা ফোর্ড গাড়ী ছিল। তার শোফার ছিল না, নিজেই গাড়ী চালাইতেন। তবে

তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই একজন ক্লীনার থাকিত, দরকার মত সেও গাড়ী চালাইত। তাহার মুখ্য কর্ত্তব্য ছিল হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া গাড়ীখানাকে ষ্টার্ট করানো! সে এক মস্ত ব্যাপার!

হ্যাণ্ডেল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইত তবুও এঞ্জিন সাড়া দিত না! গাড়ী ষ্টার্ট হইলে চারিদিকে এক ফার্লং পর্য্যন্ত লোকে সে খবরটা পাইত! যেদিন উভয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিতাম, সেদিন বাবুরাও গাড়ী লইয়া আমাকে ষ্টেশনে লইতে আসিতেন। তাঁহার গাড়ীখানা ফায়ার ব্রীগেডের মত সহর প্রকম্পিত করিয়া আসিত। আমার কাছে তাঁহার আর লোক পাঠাইতে হইত না, পৌঁছা মাত্রই আমরা খবর পাইতাম। বৃদ্ধ কিউরেটার ইঙ্গল হালিকর কাণাড়ী শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতে করিতে হঠাৎ আঁৎকাইয়া উঠিতেন, তারপর তাঁহার দাঁতহীন মুখ খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "মিঃ চাক্রাউঅর্ত্তীকে নিতে বাবুরাও এসেচেন! তা'হলে আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি বলিতাম, "বাবুরাও আপ্‌নি এত কষ্ট কর্চ্ছেন কেন? আমি তো টাঙ্গা করেই ষ্টেশনে যেতে পারি। আপনার হয়ত এতে কাজের কত ক্ষতি হয়!"

বাবুরাও মুখের বিড়ি সরাইয়া বলিতেন,—একটা বিড়ি প্রায় সারাদিনই তাঁহার মুখে থাকিত—"মিঃ চক্রবর্ত্তী, একে আপনি কষ্ট বলেন? এ যে আমার পক্ষে কত আনন্দ! বাঙালীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তা' আপনি বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি মিত্রের সঙ্গে দেখা হ'লে বুঝতে পারতেন।"

কথা বলিতে বলিতে বাবুরাও ষ্টিয়ারিং হুইলটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতেন, হয়ত চপ্পল-পরা পায়ে ব্রেক চাপিয়া পাশের গরুর গাড়ীওয়ালাকে

সাইড্ ঠিক না রাখার জন্য ধমকাইতেন, অথবা সম্মুখের ঘোড়-সওয়ারের উদ্দেশ্যে তীব্রভাবে হর্ণ বাজাইতেন। আমি অনেক সময় ভাবিয়া অবাক্ হইতাম, বাবুরাও আমেরিকা-ফেরত হইয়াও, খাঁটি দেশী পোষাকে চলেন,—মাথায় পাগড়ী পরেন, আর পায়ে চপ্পল এবং পরিধানে অধিকাংশ সময়েই ধুতি থাকে। আর ধূমপান করেন শুধু বিড়ি দিয়া। অবশ্য খুব বড় ষ্টাইল রাখিবার মত তাঁহার আর্থিক অবস্থা ছিল না, কেননা, তখন ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছিল,—তবে ছয় সাত বৎসর পাশ্চাত্য দেশে বাস করিয়া আসিয়া আবার সাধাসিধা দেশী ভদ্রলোক হইয়া যাওয়া—ইহা তখনকার দিনে আমি বাংলাদেশে কোথাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বাবুরাও খাঁটি দেশী হইলেও একটি বিষয়ে তাঁহার পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব ধরা পড়িত। তাঁহার বেশ একটু পান-দোষ ছিল। দিনে পাঁচ ছয়বার চা-পান তো করিতেনই, তার উপর সন্ধ্যাকালে চা অপেক্ষা আরও অধিক উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করিতেন। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি মোটেই স্বদেশী-ভাবাপন্ন ছিলেন না। কত সব রং-বেরং-এর লেবেলওয়ালা বোতল তাঁহার ঘরে দেখা যাইত! কিন্তু এক বিষয়ে বাবুরাওয়ের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তিনি বিকালে চিঁড়ে ভাজা, কলা ইত্যাদি সহযোগে আমার জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু কখনও তাঁহার বোতলের পানীয়ের স্বাদগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন নাই।

গাড়ীতে একত্র চলাফেরা করিতে করিতে বাবুরাওয়ের সঙ্গে আমার বেশ অন্তরঙ্গ ভাব জমিয়া উঠিল। আমি তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করিতাম, বাবুরাও অতিশয় আগ্রহের সহিত সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ও নিজের অতীত জীবনের দীর্ঘ দীর্ঘ কাহিনী বলিতেন। আমার মত কৌতূহলী শ্রোতা বোধ হয় পূর্ব্বে তাঁহার জোটে নাই। একদিন

সন্ধ্যায় নির্সী ষ্টেশনে অন্য যাত্রীরা নামিয়া গেলে আমি বলিলাম, "বাবুরাও, আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন কি ?"

বাবুরাও বলিলেন, "নিশ্চয়ই দেব ! দেব না কেন ? বলুনই না !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনার প্রেমসম্পর্কিত কোনও অভিজ্ঞতা আছে কি ?"

বাবুরাও আমার চোখে চোখে চাহিয়া জোরে হাসিলেন। তারপর বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি তরুণ, তা'তে অবিবাহিত,এ বিষয়ে কৌতূহল হওয়া আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ একথা মনে হ'ল কি করে ?"

আমি বলিলাম, "অমনি জান্‌তে চাই। মনের কৌতূহল ভিন্ন আর কিছু নয়।"

বাবুরাও বলিলেন, "আমেরিকা থাকৃতে আমি এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলাম, হয়ত তার সঙ্গে আমার বিয়েই হয়ে যেত। কিন্তু ঘটনা-চক্রে তা' হ'য়ে ওঠে নি। না হ'য়ে ভালই হয়েছিল।"

আমি বলিলাম, "কেন ?"

বাবুরাও বলিলেন, "তা'তে Bigamyর (দুই বিবাহের) দোষ হ'ত, কেননা তখন আমার স্ত্রী বেঁচে ছিল।"

বাবুরাও মুচ্‌কি হাসিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর আর কারো প্রতি প্রেম হয় নি ?"

বাবুরাও মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "হয়েছিল, সেও বহুদিনের কথা। ঐ যে গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে পাটনে রাওসাহেব আসে-যায়, যে বেশ কায়দা করে পাগ্‌ড়ী বাঁধে, তাকে নেহাৎ যুবক বলে' মনে

করবেন না। তার আমার বয়স প্রায় সমান। তা'তে আমাকে ভয়ানক শত্রুতা হয় একজনের ভালবাসা নিয়ে!"

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, "বটে? তার পর?"

"সে আমাকে ভালবাসতো, কিন্তু পাটনে তাকে বিয়ে করতে চাইলে। তার কাছে প্রেম নিবেদন করলে। সে আমার মত জিজ্ঞাসা করলে। তা' জেনে তো পাটনে রেগে আগুন!"

"আপনি কি মত দিলেন? পাটনে তো যোগ্য পাত্রই ছিল।"

"আপনার আমার মতে যোগ্য পাত্র হ'লে কি হ'বে, সে তা মনে করেনি। আমিও অবাক্ হ'য়ে বলি, 'সর্ব্ব শেষে পাটনের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে?'

"সে কি বল্‌ল?"

"সে হেসে কুটি কুটি হ'ল।"

"সে আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?"

"হতে পারে। তবে আমাকে তা' কোনো দিনও বলে নি।"

"আপনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করবেন না ব'লে কি সংকল্প করেছিলেন?"

"তা' নয়। সে সময় আমি চাকরি কর্‌তাম, মস্ত বড় একটা বাঁধ তৈরিতে উঠে-পড়ে' লেগে গিয়েছিলাম। ও কথাটা ভাল করে ভাব্‌বার অবসর হয় নি।"

তারপর আরও গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হয়ত তা'কে বিয়ে করলে এখন আর প্রতি সন্ধ্যায় বোতল ঢাল্‌তে হ'ত না, দিনগুলি ভালই কাটত। জীবনে সব বিষয় ঘটে ওঠে না। মানুষ সুযোগ পেয়েও এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও সব কাজ কার্য্যতঃ করে উঠ্‌তে পারে না। এটাই হ'ল মনুষ্যজীবনের ট্রাজেডি!"

তখন গাড়ী সিংপুরে আসিয়া থামিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁর কি বিয়ে হয়েছিল ? তিনি এখন কোথায় ?"

বাবুরাও বলিলেন, "সে সব কথা জিজ্ঞাসা করে কি হ'বে ? সে যে অতীতের কাহিনী ! দশ বৎসর পূর্ব্বেই সে আমার জীবন হ'তে স'রে প'ড়েচে।" বলিয়া বাবুরাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং তাড়াতাড়ি হাতব্যাগখানি লইয়া নামিয়া পড়িলেন। প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে একাই ঘরে গেলাম।

৩

একদিন বিকালে বাবুরাও হাঁটিয়া মিউজিয়ামে আমার কাছে আসিলেন। বলিলেন, তাঁহার গাড়ীখানা কারখানাতে পাঠানো হইয়াছে, তুজনে পায়ে হাঁটিয়াই ষ্টেশনে যাওয়া যাক। আমি আনন্দের সহিত রাজী হইলাম। তিনি একটা গলির পথ দিয়া আমাকে লইয়া চলিলেন। সে একটা পুরাণো সরু রাস্তা, ইট-পাথর তাহাতে অতি কম, সেখান দিয়া বেশী লোক চলা-ফেরা করে না, গাড়ী-ঘোড়া একেবারেই চলে না বলিলেও হয়। রাস্তার তুই ধারে অতি পুরাণো বাড়ী। কোনওটা মনে হইল অন্ততঃ তুই শত বছরের পুরাণো হইবে। এক জায়গায় একটা ছোট ভাঙা মন্দির ছিল, গড়ন দেখিয়া বোধ হইল, তাহা প্রথম জৈন যুগের, প্রায় তুই হাজার বছর আগেকার। এক এক জায়গায় তুই দিকের বাড়ী-ঘর ধ্বসিয়া গিয়াছে, রাস্তাটা ধূলায় ধূলায় শাদা হইয়া রহিয়াছে, ঘরের পাশে সবুজ রংয়ের ক্যাক্‌টাস গাছ উঠিয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব চোখে ঠেকিল, অথচ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যেন একটা অজানা বিষাদের ছায়া, একটা নৈরাশ্যের অবসাদ সে রাস্তাটাকে

ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, প্রত্যেক দরজায় তালা, লোকজন নাই, রাস্তায় ছেলে-পিলে হল্লা করিয়া বেড়ায় না। বাবুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি?" বাবুরাও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "প্লেগ! রোজ বড় রাস্তা দিয়ে যান বলে' তা' দেখ্‌তে পান না।"

দেখিলাম, সমস্ত গলিটার মধ্যে শুধু এক জায়গায় লোকের ঘন বসতি, মেয়ে মানুষেরা সারি বাঁধিয়া ঘরের পইঠায় বসিয়া আছে। কেহ কাহারও চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ ডাল চাল বাছিতেছে, কোথাও চার পাঁচ জনে মিলিয়া গল্প করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িলাম, চারিদিকে মনসার বেড়া, স্তূপে স্তূপে পাথর পড়িয়া আছে, কিন্তু সামনে গিয়া দেখা গেল, সুন্দর হালফ্যাসানের একটি বাংলা, দোতলা,—লাল ম্যাঙ্গলোরী টাইলের ছাউনি, চারিদিকে বারান্দা, রেলিং, সাম্‌নে ছোট্ট একটি বাগান, তাহাতে গোলাপ, যুঁই, রজনীগন্ধা আর বহুবর্ণের মরসুমি ফুল ফুটিয়া আছে। এত সব ধ্বংসাবশেষ ও দরিদ্রের কুটীরের পর এ সুন্দর বাড়ীখানা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, "চমৎকার বাড়ীখানা তো!"

বাবুরাও বাড়ীটির দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিলেন। তারপর ফটকের সামনে গিয়া মিনিট-খানেক দাঁড়াইলেন। বাগানে একজন চাকর গাছের গোড়া হইতে খুরপি দিয়া ঘাস খুঁটিয়া তুলিতেছিল, আর একজন একটা ঝারি দিয়া গাছের পাতায় জল ঢালিতেছিল। দুজনেই নীরব। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, বাবুরাওয়ের দৃষ্টি দোতলার বারান্দার উপর দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হইয়া আছে। আমি তাহার দিকে কৌতূহলী হইয়া চাহিলাম। তিনি হঠাৎ চোখ নামাইয়া লইলেন। তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক রকম ম্লান হইয়া গেল। আমি বলিলাম, "কি বাবুরাও?"

বাবুরাও কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তারপর নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলেন। আমি ইহাতে অবাক্ হইলাম। হঠাৎ যেন। তাঁহার সমস্ত সৌজন্য, সমস্ত সরলতা অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলকে কঠোর করিয়া তুলিল। আমি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

সে দিন গাড়ীতে বাবুরাও খুব বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন—আমার সঙ্গে সাধারণ দুচার কথা হইল।

তার পর দিন আমি একা সে পথ দিয়া যাইতেছিলাম। সে দিনও বাবুরাও আর আমি একত্র ষ্টেশনে যাইবার কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবুরাও আসিলেন না। আমি চলিতে চলিতে গতদিন বাবুরাওয়ের আকস্মিক ভাবান্তরের কথা ভাবিতেছিলাম। বাংলাটার সামনে আসিলে আমি অন্যমনস্কভাবে ইহার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সেই পশ্চিম দিকে মনসার বেড়া, তারপর পাথরের স্তূপ। এক পাশে চার পাঁচটা বড় বড় পাথর ছড়াইয়া আছে, দুটার গায়ে শাদা চুণের লেপ। বাগানের চারিদিকে কাঁটা দেওয়া তার। ভিতরে একসার রজনীগন্ধা, তাহাতে আধ-ফোটা কলি, তার পাশে গোলাপ, একটা গোলাপের ডাল সবকে ছাড়াইয়া উপর দিকে উঠিয়াছে, তাহাতে একটি বড় গোলাপ ফুটিয়া আছে। ফটকের উপর ঝুমকার লতা, তার পর যুঁই।

বাড়ীর কম্পাউণ্ড প্রায় ছাড়াইয়া আসিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, সম্মুখের দিক হইতে একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ী আসিতেছে। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়াইলাম। দেখিয়াই মনে হইল, এ ভাড়াটে গাড়ী হইতে পারে না। প্রকাণ্ড এক জোড়া অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়া, চালকের পরনে লাল কুর্ত্তা, পাগড়ী, হাতে শালুমোড়া লম্বা চাবুক। গাড়ীর রং চক্‌চকে।

গাড়ীখানা খোলাই ছিল। পিছনের গদীতে বসিয়াছিলেন একটি মহিলা। উজ্জ্বল 'দুধে-আলতার রং'; নাকে-মুখে-চোখে এক অসাধারণ কমনীয়তা, যদিও বয়স প্রায় ত্রিশের মত হইবে। তাঁহার শরীরের নিম্নভাগ একখানা মূল্যবান্ শাল দিয়া ঢাকা ছিল, বোধ হয় ধূলা হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য। তাঁহার পরনে ফিকে বাদামী রংয়ের সিল্কের শাড়ী ও কাঁচুলি। হাতে হীরা-বসানো দুই গাছা চুড়ি। মহিলাটির বসিবার সুচারু ভঙ্গিমা, দৃষ্টির দৃঢ়তা, আর চেহারায় একটা অবর্ণনীয় স্থৈর্য্য তাঁহার আভিজাত্য ঘোষণা করিতেছিল।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম। গাড়ী চলিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই তার ঘর্ঘর শব্দ থামিল। ফিরিয়া দেখিলাম, গাড়ীখানা সে সুন্দর বাড়ীটির উঠানে ঢুকিল।

ষ্টেশনে যাইতে যাইতে বাবুরাওয়ের গত দিনের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথা মনে হইল। আমার কাছে সমস্ত বিষয়টা রহস্যে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলাম, "এ মহিলা কে? ইনি তো বাবুরাওয়ের চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ নন্?"

মনে হইল, বাবুরাও যদি দুইবার নারীতে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন—বিবাহটা না হয় বাদই দেওয়া গেল,—তবে তৃতীয় বার হওয়াতে বাধা কি? আর তৃতীয় বারই বা বলি কেন—হয়ত চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ বারও হইতে পারে!

ভাবিলাম, কিষাণপুর ছাড়িবার আগে এ রহস্যটা ভেদ করিতেই হইবে। প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে না হয় একটা জীবন্ত তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়া গেলাম!

ষ্টেশনে গিয়া বাবুরাওয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার গাড়ী মেরামত হইয়াছে, তাই তাঁহাকে হাঁটিয়া আসিতে হয় নাই। বলিলেন,

আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মিউজিয়মে গিয়া দেখেন, আমি চলিয়া গিয়াছি। গাড়ী কারখানা হইতে খুব দেরী করিয়া আসিয়াছিল। তাই যথাসময়ে খবর দিতে পারেন নাই।

সেদিন নির্সী ষ্টেশনের পর গাড়ী খালি হইলে বাবুরাও বেঞ্চের উপরে সটান হইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার চোখ বুজিয়া আসিল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। গাড়ীর জানালা খোলা ছিল, বাহিরে অন্ধকারের ভিতর এক একবার এক একটা গাছ অথবা পাহাড়ের টিলা মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। কোথাও আমাদের এঞ্জিনের সার্চ্চ লাইট পড়িয়া লেভেল ক্রসিং-এতে দাঁড়ানো মোটর ও গরুর গাড়ীগুলিকে ঝলসাইয়া তুলিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমি ভিতরের দিকে চাহিয়া বসিলাম। গ্যাসের আলোর নীচে বাবুরাওয়ের ঘুমন্ত মুখ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমি অভিনিবেশের সহিত তাঁহার সে পুরু ভ্রূ, তার নীচে কোটরগত দুইটি চক্ষু, তার নীচে ঈগল পাখীর ঠোঁটের মত নাকটি, মসৃণ করিয়া কামানো, কতকটা বুড়ো মেয়েমানুষের মত, তাঁহার ঈষৎ উল্টানো ঠোঁট ও ভাঙা গাল, আর তাঁহার চেপ্টা, দুইভাঁজ করা চিবুক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, যেন মারাঠা চরিত্রের সমস্ত তীক্ষ্ণতা, সমস্ত জটিলতা ঐ মুখটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এ জাতির ভিতর বুদ্ধিবৃত্তির যে ঘাতপ্রতিঘাত গিয়াছে, আমার সম্মুখের মুখটিতে যেন তার সমস্ত ছাপ অঙ্কিত হইয়া আছে।...

আমার মনে নানারকম কল্পনা জাগিতে লাগিল। জানিয়াছিলাম, বাবুরাও বিপত্নীক। তবে কি তিনি এখন গোপনে প্রেমলীলার অভিনয় করেন? হয়ত তিনি সেই মহিলাটির প্রতি আসক্ত হইয়াছেন,

হয়ত তাঁহার জন্য নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য খোওয়াইয়া ফেলিতেছেন,—তাই তাঁহার এত বৃহৎ ব্যবসা সত্ত্বেও তিনি নির্ধন, তাই তাঁহার ঐ পুরাণো ফোর্ড গাড়ী !

ভাবিলাম, হয়ত ঐ সুন্দর বাংলাটি তিনিই ভাড়া করিয়াছেন, সে ভিক্টোরিয়া গাড়ীটি তাঁহারই, সেই একান্তে অধিবাসিনী রূপসী নারী তাঁহারই প্রেম-পাত্রী !

পরদিন সকালে কিষাণপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমি মোটর বিদায় করিয়া দিয়া গলির পথে হাঁটিয়া চলিলাম। ভাবিলাম, নূতন কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা, দেখা যাক। সে বাংলাটির কাছে আসিলে দেখিলাম, বাগানের লাল রাস্তার উপর দুইটি শিশু ছোট হকি ষ্টিক লইয়া খেলা করিতেছে। তাহাদের গায়ে নীল সেলর স্যুট, পায়ে মোজা, জুতা। একটা লম্বা লোমওয়ালা, ছোট্ট, কালো মিশমিশে বিলিতি কুকুর তাহাদের পাশে ছুটাছুটি করিতেছে। খেলিতে খেলিতে ছেলেদুটি মিঠে গলায় এক একবার ডাকাডাকি করিতেছে। তাহাদের অতি কোমল চেহারা, চক্ষু শান্ত, গতি ছন্দোময়,—আভিজাত্যের চিহ্ন !

আমি সে বাড়ীর ফটক পার না হইতেই সেই অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়ায় টানা ভিক্টোরিয়া গাড়ীটি আসিল। আজ তাহা হইতে নামিল একটি মেয়ে, এগারো বারো বছরের, পিঠে বেণী দুলানো, তার গোড়ায় ফ্লু বাঁধা, হাতে একটা ছোট ব্যাগ ও শ্লেট। সে বাগানের মাঝখানে গিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া কি বলিল এবং হাসিল। শান্ত, মিষ্টি হাসি, যেন একটা অজানা সংযম-মাখা, যাহা শুধু অভিজাতদের মধ্যেই সচরাচর দেখা যায়।

সেদিন বিকালে গাড়ীর সময়ের বহু আগেই আমি মিউজিয়াম

ছাড়িয়া বাবুরাওয়ের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম, বাবুরাও একান্তমনে বিড়ি টানিতেছেন ও চিঠি লিখিতেছেন। চিঠি লেখা শেষ করিয়া ও তাহা পিয়নের হাতে দিয়া তিনি আমার সঙ্গে সাময়িক রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

ট্রেনের সময়মত যখন আমরা মোটরে উঠিতে যাইব, তখন দেখা গেল, একটি চাকাতে হাওয়া নাই। ক্লীনার হাওয়া করিতে গিয়া দেখিল, চাকাতে পাংচার হইয়াছে। সে চাকা বদ্‌লাইয়া অপর চাকা লাগানো পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না, তাই আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। ভরসা ছিল, সামনের রাস্তায় গিয়াই টাঙ্গা পাইব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা পাওয়া গেল না। তখন আমরা দুজনে অতি দ্রুতপদে হাঁটিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। অবশ্য গলির রাস্তাই ধরিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে তখনও রাজনীতির আলোচনাই চলিতেছিল। কিন্তু আমি প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সুন্দর বাংলাটির কথা ভাবিতেছিলাম।

সেখানে আসিলে দেখিলাম, সেদিনকার মহিলাটি রাস্তার উপরের জানালায় বসিয়া আছেন; তাঁহার পরিধানে ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটি মিহি শাড়ী; তার আঁচলের কোণটি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং বাতাসে উড়িতেছে। তাঁহার মুখের উপর অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ আভা পড়িয়া সেই দুধে-আল্‌তা রঙের মধ্যে একটা স্থির, শান্ত, ঔদাস্য-মাখা লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

বাবুরাও হঠাৎ থামিয়া দৃঢ়দৃষ্টিতে সে মুখের দিকে চাহিলেন। মহিলাটিও অবিচলিতভাবে বাবুরাওয়ের দিকে চাহিলেন। তারপর বাবুরাও আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

ভাবিলাম, সে দৃষ্টির অর্থ কি? আমি কলিকাতায় পাশের বাড়ীর

বাতায়নে উপবিষ্টা তরুণীর পানে মেসের ছাত্রের চঞ্চল বুভুক্ষু দৃষ্টি দেখিয়াছি ; রাস্তায় সুবেশা তরুণীর সম্মুখে আফিসগামী কেরাণী বাবুর পান-রাঙা ঠোঁট হঠাৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অশ্লীল হাসিতে বাঁকিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। আবার এমন মহিলাও দেখিয়াছি, অপরিচিত পুরুষ তাঁহাদের দিকে চাহিলেই, যেন তাঁহারা ভাবিতে আরম্ভ করেন, "নারীর রূপ আকাশকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করে!" কিন্তু বাবুরাও বা সে-মহিলাটির দৃষ্টির ভিতর কোনও রকম চিত্তচাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

তবে বাবুরাও যখন চলিতে লাগিলেন তখন আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনি যেন একটা তীব্র উত্তেজনা ঠোঁট মুখ চোখ দিয়া সজোরে চাপিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার গতি শিথিল হইয়া পড়িল, হাত পা যেন সহসা অসাড় হইয়া আসিল। উভয়ে নীরবে ষ্টেশনে আসিলাম। কিন্তু সেদিন এত তাড়াহুড়া করিয়া আসিয়াও গাড়ী ফেল হইল। বাবুরাও আমাকে প্ল্যাটফর্ম্মে বসাইয়া একখানা টাঙ্গায় চড়িয়া শহরে গেলেন এবং আধঘণ্টা পরে তাঁহার ফোর্ড গাড়ীখানা লইয়া হাজির হইলেন। সেই সন্ধ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাবুরাও, আমি ও তাঁহার ক্লীনার আবদুল, তিনজনে সেই জীর্ণ ফোর্ড গাড়ীটিকে আশ্রয় করিয়া পঁচিশ মাইল পাহাড়ে পথের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। সে যাত্রায় কি দুর্ভোগই না ভুগিলাম! প্রথমবার পাহাড় চড়িবার সময়েই হঠাৎ গাড়ীর এঞ্জিন বন্ধ হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ হ্যাণ্ডেল ঘুরাইবার পর তাহাকে ষ্টার্ট করা গেল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আবার এঞ্জিন বন্ধ হইল, তখন তিনজনে মিলিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাকে পাহাড়ের চূড়ায় লইয়া তুলিতে হইল। যখন গাড়ী ঠিক ঠিক চলিত, তখন বাবুরাও ষ্টীয়ারিং হুইল ধরিয়া গ্যাট হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহার তীক্ষ্ণ চোখ

দুটি রাস্তার উপরে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকিত। এক একবার মোড় ফিরিবার সময় তাঁহার হাতের পাঞ্জাটি লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিত, ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া পড়িত, কপালে ঘাম দেখা দিত। একবার হঠাৎ একটা মোড় ফিরিয়া দেখা গেল, গাছের ছায়ার অন্ধকারের ভিতর হইতে যেন ত্রিশ চল্লিশটি মুক্তা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাবুরাও দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ব্রেক চাপিলেন, বারংবার হর্ণ বাজাইতে লাগিলেন। ভেড়ার দল রাস্তার দুপাশে ছড়াইয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "ভেড়ার চোখ আলোতে ওরকম দেখায় ?"

বাবুরাও গাড়ীখানা খোলা মাঠের উপর আনিয়া, আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চোখের কি চমৎকার mechanism (সৃষ্টি-কৌশল) তা' আপনি জানেন না, মিঃ চক্রবর্ত্তী ?"

কিন্তু ওসব আলাপ করিবার আর অবসর রহিল না। কেননা, টিলা চড়িতে গিয়া গাড়ীখানা আবার থামিয়া গেল। সে রাত্রে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অন্ততঃ পাঁচটা কি ছয়টা টিলা পার হইলাম। কিন্তু কেবল তাহা হইলেও হইত। দুইবার চাকা পাংচার হইল, প্রথমবার "স্পেয়ার" হুইল লাগানো হইল, কিন্তু দ্বিতীয়বার রাস্তার পাশে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়া ছেঁড়া রবার জোড়া দিতে হইল ! সিংপুরের কাছাকাছি আসিয়া দেখা গেল, তেলের পাইপ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বহু পর্য্যবেক্ষণের পর সে ত্রুটি ধরা পড়িল, এবং বাবুরাওয়ের নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত নানা ফন্দি দ্বারা সে ভাঙা পাইপটিকে কাজের উপযোগী করা হইল।

বাবুরাও যখন সকল কলকব্জা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আমি ধীরে ধীরে রাস্তায় পাইচারি করিতে লাগিলাম। চারিদিকে সুদূরবিস্তৃত মাঠ ও পাহাড় জ্যোৎস্নালোকে ডুবিয়া গিয়াছিল। পাশে একটা ক্ষেতে জোয়ারীর লম্বা সরু পাতাগুলি নীচের জমির সঙ্গে

আলো-ছায়ার খেলা খেলিতেছিল। পাইচারি করিতে করিতে ফিরিয়া যখন মোটরের কাছে আসিলাম, তখন দেখিলাম, বাবুরাও এঞ্জিনটির উপর ঝাঁকিয়া পড়িয়া এক অংশ বিশেষ করিয়া দেখিতেছেন। তখন হঠাৎ আমার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল, নেভি ব্লু স্যুটপরা দুইটি ছেলে ছোট্ট হকি ষ্টীকের উপর নুইয়া বলে ঘা দিতেছে, আর উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিতেছে ; একটা ছোট কালো কুকুর সঙ্গে সঙ্গে ছুটাছুটি করিতেছে। আর একটা লম্বা গোলাপের ডাল, তাহাতে একটা বড় গোলাপ, আর তার পাশে গোলাপেরই মত মুখ একটি ছোট্ট মেয়ে, সবুজ পাত্‌লা শাড়ী-পরা, পিঠে বেণী দুলানো, হাতে ছোট একটি ব্যাগ ও শ্লেট। মনে হইল ঐ তিনটি শিশুমুখ আর বাবুরাওয়ের মুখে এক অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে !

তেলের পাইপ ঠিক হইলে বাবুরাও আবার ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিলেন এবং যাত্রা করিবার সাড়ে চার ঘণ্টা পরে, রাত্রি বারোটাতে পঁচিশ মাইল পর্য্যটন শেষ করিয়া আমরা সিংপুরে পৌঁছিলাম।

৫

পরদিন বিকালে মিউজিয়ামে বাবুরাওয়ের চাকর আমার কাছে একখানা চিঠি লইয়া আসিল। তিনি এক ভদ্রলোককে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং আমাকেও তাহাতে যোগ দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুটাইয়া উঠিলাম এবং বাবুরাওয়ের বাড়ীতে চলিলাম। বাড়ীর কাছে গিয়া অবাক্ হইয়া দেখিলাম, সেই দুই অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়ায় টানা ভিক্টোরিয়া গাড়ীখানা বাবুরাওয়ের বাড়ীর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সেই লাল কুর্ত্তা ও পাগড়ীপরা সইস ঘোড়ার মাথার পাশে দাঁড়াইয়া গলার উপর হাত বুলাইয়া দিতেছে।

ভিতরে গিয়া দেখিলাম, বাবুরাওয়ের টি-রুমটি অতিরিক্ত রকম সজ্জিত। টেবিলের উপর সুন্দর একখানা চাদর পাতা হইয়াছে, তার উপর দুইটা ফুল-দানী, তাহাতে সব তাজা ফুল।

দেখিলাম, বাবুরাওয়ের পাশে একজন যুবাবয়সী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। খাসা চেহারাটি তাঁহার। প্রবেশ মাত্রই বাবুরাও আমাকে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, ক্যাপ্‌টেন ভোস্‌লে।" ভোস্‌লে মৃদু হাসিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া করমর্দ্দন করিলেন ও যথারীতি কুশল প্রশ্ন করিলেন। সে সব নেহাৎই মৌখিক ভদ্রতা হইলেও, সে হাসি, সে করমর্দ্দন, সে কুশল প্রশ্নের সুরের ভিতর কেমন একটা বৈশিষ্ট্য, একটা মার্জ্জিত ভাব, একটা সুরুচি ফুটিয়া উঠিল, যাহা বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না।

বাবুরাও তাঁহার নিকট আমার সব খবর বলিলেন। শেষে ইহাও বলিলেন যে, বাঙ্গালীর সঙ্গে তাঁহার বহুকালের যোগ, নিউইয়র্কে বাবু সুকুমার রায় ও দাশরথি মিত্রের সঙ্গে দেড় বৎসর একত্র ছিলেন।

ভোস্‌লে মধ্যভারতের কোনও দেশীরাজ্যের ফৌজে ক্যাপ্‌টেন। তিনি বলিলেন, তাঁহারও বাঙ্গালী বন্ধু আছেন। তিনি বাংলাদেশের বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, তিনি দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন, তাহা খুব সুন্দর জায়গা, ইত্যাদি। আমি ভোস্‌লের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইলাম।

একটা রূপার ট্রের উপর বাবুরাওয়ের শ্রেষ্ঠ চায়ের সেট লইয়া সুসজ্জিত ভৃত্য আসিল। বাবুরাও চা ঢালিতে লাগিলেন। ভোস্‌লে উঠিয়া দুধ মিশাইয়া দিতে লাগিলেন।

চা খাইতে খাইতে প্লেগের কথা চলিতে লাগিল। আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলাম, ভোস্‌লে কেমন সুকুমারভাবে

চায়ের পেয়ালা ধরিয়াছেন, কেমন সৌষ্ঠবের সহিত পেয়ালা হইতে চা পান করিতেছেন।

আমি ভোস্‌লেকে তাঁহাদের ফৌজের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার ধারণা ছিল, মিলিটারী লোক বুঝি সবাই কাঠখোট্টা গোছের, তাহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝি শুধু বীরত্বই ঘোষিত হয়। ভোস্‌লেকে দেখিয়া সে ধারণা দূর হইল।

হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া বাবুরাও বলিলেন, "আপনি সেদিন যে বাংলাটির তারিফ কচ্ছিলেন ক্যাপ্‌টেন ভোস্‌লে সেখানে থাকেন।"

বলিতে বলিতে বাবুরাওয়ের চোখদুটি কুঞ্চিত হইয়া পড়িল। আমার শরীরে যেন একটা অকারণ রোমাঞ্চ বহিয়া গেল। আমি ক্ষণেকের জন্য ভোস্‌লের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, ইনি কি সেই মহিলার স্বামী? মনে হইল, অসম্ভব। তিনি সে মহিলা হইতে বয়সে ছোট হইবেন। তবে উনি কে?

বাবুরাও হঠাৎ গম্ভীর হইয়া, পূর্ব্ব বিষয় ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্যাপ্‌টেন, প্লেগের সময়ে যে প্লেগ এরিয়া (area)-তে থাকা উচিত নয়, একথা আপনাকে বোঝাতে হ'চ্চে এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

ভোস্‌লে বলিলেন, "আমাদের বাড়ীর কাছে তো কেস্ হয় নি, শুধু ইঁদুর পড়েচে।"

বাবুরাও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তার মানে প্লেগ নয়? ইঁদুর মরে ঠাণ্ডা হওয়া মাত্র তার গায়ের পিশুগুলো সরে পড়ে, তারপর মানুষ সাম্‌নে পেলেই গায়ে লাফিয়ে ওঠে।"

ভোস্‌লে বলিলেন, "আমাদের পাড়ায় তো আরো লোক রয়েচে!"

বাবুরাও হঠাৎ থামিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "পাড়ার ঐ গরীব লোকদের কথা বলচেন? তারা জীবন-মরণ সম্বন্ধে কি জানে?

পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মে, আবার পঙ্গ পালের মতই ঝাঁকে ঝাঁকে মরে! ওদের নিজের বিচার-শক্তি আছে? 'পাড়ার মাতব্বর যখন আছেন, তখন আমরা থাক্‌বো না কেন?' এই হ'ল তাদের যুক্তি! কেউ যদি প্লেগ হয়ে মরে যায়, তবে তারা বল্‌বে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা! অদৃষ্ট কে খণ্ডাবে?' অথচ আমরা রোজ পঞ্চাশ মাইল রেল চড়ে' অদৃষ্ট খণ্ডাবার চেষ্টা কচ্ছি!"

ভোস্‌লে হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা পঞ্চাশ মাইল রেল চড়েও তো দিনের অধিকাংশ ভাগ কিষাণপুরেই কাটাচ্চেন, আমরা না হয় আর একটু বেশী কাটালাম।"

বাবুরাও বলিলেন, "প্লেগ যে "ফ্লী"র ব্যাপার! দিনের আলোতে তারা আস্‌তে পারে না। তাই রাত্রিতে "এরিয়ার" বাইরে থাক্‌লেই পনের আনা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।" তারপর বলিলেন, "আপনারা জেনে' শুনে' এই প্লেগের দিনে কিষাণপুরে এলেন কেন, ক্যাপ্‌টেন ভোস্‌লে?

ক্যাপ্‌টেন মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "দেখুন, শুধু আমরা আসি নি, মিঃ চক্রবর্ত্তীও কোন্‌ দূর থেকে এসেচেন!"

"আপনার দায়িত্ব মিঃ চক্রবর্ত্তীর চেয়ে অনেক বেশী!" বলিয়া বাবুরাও ভোস্‌লের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ক্যাপ্‌টেন, আপনাকে আমার মতে আনা কঠিন দেখ্‌চি। আপনার বৌদিকে বল্‌বেন, আমার অনুরোধ তাঁরা যেন সত্বর এ জায়গা ছেড়ে দেন।"

ভোস্‌লে বলিলেন, "তা' বেশ। তবে আমি আর বলি কেন, আপনিই এসে সম্‌ঝিয়ে বলবেন। আগামী কাল আপনাদের দুজনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। বিকালে চারটায়।"

ভোস্‌লে উঠিয়া অতি সৌজন্যের সহিত আমাদের উভয়ের নিকট

বিদায় লইলেন। বাবুরাও ও আমি দরজা পর্য্যন্ত গেলাম। বিশাল অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়া দুটি তাহাদের মাংসবহুল দেহ দুলাইতে দুলাইতে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া দেখিলাম, বাবুরাও ভিতরের কামরায় চলিয়া গিয়াছেন এবং সজোরে বোতলের ছিপি খুলিতেছেন।

৬

পরদিন যথাসময়ে বাবুরাওয়ের বাড়ী গিয়া দেখিলাম, তিনি ঘরে নাই। কিছুক্ষণ বসার পর তিনি তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আসিলেন। সে গাড়ীখানা দেখিয়া সেদিনকার রাত্রির অভিযানের কথা মনে পড়িল।

বাবুরাও বলিলেন, তাঁহার হাতে অনেক কাজ, তিনি আসিতে পারিবেন না। আমি যেন ক্যাপটেন্ ভোস্লের কাছে তাঁহার আসিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি এবং আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আমি যেন তাঁহার হইয়া সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি।

আমি বলিলাম, "যাবার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল আপনি ক্যাপ্টেন্ ভোস্লের বৌদিদিকে প্লেগের বিষয় বুঝিয়ে বল্বেন, নয় কি?"

বাবুরাও আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন ভাবিতেছেন, আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছি।

একটু থামিয়া অত্যন্ত কঠিনভাবে বলিলেন, "আমি সে ইচ্ছা ত্যাগ করেচি। তবে আমি যদি আশা করি, মিঃ চক্রবর্ত্তী, যে আপনি আমার হয়ে সে কাজটা কর্বেন, তবে কি তা' বেশী আশা করা হয়?"

আমি বাবুরাওয়ের ভাবগতিক দেখিয়া অবাক্ হইলাম। বলিলাম, "তা' আপনার হ'য়ে আর বলার দরকার কি? আপনার আজ সময় না হয়, আর একদিন যাবেন, আজ আমরা যাব না বলে খবর পাঠান।"

বাবুরাও উন্মনস্কভাবে ঘরে পাইচারি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “মিঃ চক্রবর্ত্তী, আজ কেন, ককখনই আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আপনাকে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হ’বে!”

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, “তার মানে?”

সহসা বাবুরাওয়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। মুখের মাংসপেশী কুঞ্চিত হইয়া পড়িল। চোখের দৃষ্টি ক্লিষ্ট রইল। বাবুরাও বলিলেন, “মিঃ চক্রবর্ত্তী! আপনি তরুণ, আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত ভবিষ্যৎ। যাদের ভবিষ্যৎ নেই, শুধু অতীত আছে, আর সে অতীত ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাদের পেছনে লেগে থাকে, তাদের প্রতি আপনার সহানুভূতি জাগে না? বলুন! বলুন!”

বলিয়া বাবুরাও আমার অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল।

তাঁহার চক্ষু একটু বেশী রকম লাল হইয়া উঠিল। আমি শুধু ধীরে ধীরে বলিলাম, “আজ এ অসময়ে পান করেছেন কেন, বাবুরাও?”

বাবুরাও অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন, “মিঃ চক্রবর্ত্তী, আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করবেন। আশা করি, আজকার এ এন্‌গেজ্‌মেণ্ট নষ্ট করবেন না। আমি যদি আস্‌তে পার্‌তাম, তবে অবশ্যি আস্‌তাম। আপনি আমার গাড়ীটা নিয়ে যান। আবদুল—” বলিয়া আবদুলকে দক্ষিণী উর্দ্দুতে গাড়ীর বিষয়ে বলিয়া বাবুরাও ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি শুধু লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাঁহার ঠোঁট আর হাতের আঙ্গুল কেমন কাঁপিতেছে। আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল; ভাবিলাম, এ মাতালকে লইয়াই বা কি হইবে? একাই গিয়া গাড়ীতে বসিলাম।

গাড়ী ষ্টেশনের পথে ঘুরিয়া ভোস্‌লেদের বাড়ীতে গেল। বাড়ীতে ঢুকিবার সময় মনে হইল, আমি যেন অতি পরিচিত স্থানে যাইতেছি। কেননা প্রত্যেকটি ইট-পাথর গাছ-গাছড়ার ছাপ ইতিপূর্ব্বে আমার মনে বসিয়া গিয়াছিল। গাড়ী থামিতেই দরজায় আসিয়া ক্যাপ্‌টেন্ ভোস্‌লে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও উপরে লইয়া গেলেন। সিঁড়ির উপর কার্পেট পাতা ছিল। দোতলার মধ্যখানে একটি হল ঘরে গিয়া উঠিলাম। দেওয়ালে সুন্দর সব চিত্র ঝুলানো ছিল; অধিকাংশই বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপের। কোথাও এ্যালপস্ পাহাড়, কোথাও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লেক, কোথাও জার্ম্মেনীর কালো বন, কোথাও বা ইংলণ্ডের সমুদ্রকূল। একখানা বড় ছবিতে দেখানো হইয়াছিল, সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে একটা জাহাজ হাবুডুবু খাইতেছে, অথচ তাহার সুন্দর কেবিনগুলি ভিতরের আলোতে মায়াভবনের মত দেখাইতেছে। ঘরের আসবাব সব ভারী কালো কাঠের। চেয়ারে মখ্‌মলের গদি আঁটা।

ক্যাপ্‌টেন্ ভোস্‌লে আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার গবেষণা কিরূপ চলিয়াছে, জানিতে চাহিলেন। কিছুকাল পরে বলিলেন, "বাবুরাও এলেন না তা' হ'লে?" এ প্রশ্নটা বাড়ীর দরজাতেই জিজ্ঞাসা করা হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। হয়ত আমি যে শুধু বাবুরাওয়ের সাঙ্গোপাঙ্গ নই, তাহা বুঝাইবার জন্যই তখন সে-প্রশ্ন করা হয় নাই। সৌজন্য বটে!

বড় বড় বিলাতী ছবির মাঝখানে দু-একখানা ফোটোও ছিল। একটাতে দেখিলাম, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি সুসজ্জিতা তরুণী মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কার চিত্র। ভোস্‌লে বলিলেন, তাঁহার দাদা ও বৌদির। তারপর তাঁহার দাদার বিষয়ে কথা-বার্ত্তা চলিল। তিনি ছেলেবেলাতেই বিলাত গিয়াছিলেন, সেখান

হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন, তারপর বম্বেতে সলিসিটার হ'ন। ছবিটা তাঁহার বিবাহের কিছু পরে তোলা। তিনি একটু বেশী বয়সেই বিবাহ করিয়াছিলেন। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা।

চা খাইতে খাইতে তাঁহার দাদার কথাই বিশেষ করিয়া হইল। তিনি খুব আর্টের ভক্ত ছিলেন, তাই ঘরে ও সব ছবি। সঙ্গীতেও তাঁহার খুব রুচি ছিল,—প্রাচ্য, পাশ্চাত্য উভয়েই। তাঁহাদের পরিবার কিষাণপুরেরই বাসিন্দা। বুঝিলাম, ইঁহারা খুব বুনিয়াদি ঘরের লোক। শহরের অপর ভাগে তাঁহাদের পুরাণো বাড়ী আছে, তবে ক্যাপ্‌টেন ভোঁস্‌লে তাহা পছন্দ করেন না। তিনি খুব আমোদের সহিত সে বাড়ীর বর্ণনা দিলেন। প্রকাণ্ড সাবেকী দরজা, তাহাতে তিনটা মুষল লাগাইয়া বন্ধ করিতে হয়। তারপর হাসিয়া বলিলেন, "ও-সবের ওপর আপনাদের কোনো গবেষণা চলে না ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের বাড়ীতে পুরাণো কাগজপত্র আছে কিনা।

ভোস্‌লে এ-কথায় আবার হাসিলেন। বলিলেন, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে খুব পণ্ডিত-গোছের লোক ছিলেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁদের গর্ব্ব ছিল ঘোড়ায় চড়াতে আর অতর্কিতে শত্রুকে আক্রমণ করাতে ও কার্য্য সমাধা করে' আবার তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের ভিতর ছুটে আসাতে। মিলিটারী বিদ্যাও যে তাঁদের খুব বেশী আয়ত্ত ছিল, তা' নয়। তাঁরা চল্‌তে জান্‌তেন, তাই এগিয়ে গিয়েছিলেন !"

চা-পানের পর ভোস্‌লে বলিলেন, "আচ্ছা, এখানে প্লেগ বাস্তবিকই হচ্চে নাকি, না শুধু লোকের আতঙ্ক ?"

আমি সেদিনকার কেসের সংখ্যা বলিলাম।

ভোস্‌লে বলিলেন, "বৌদি কিন্তু ও কথা শুনে' খুবই ভয় পেয়েচেন। এবং শিগ্‌গিরই বাড়ী ছাড়তে চাইচেন।"

আমি বাবুরাওয়ের উপদেশ স্মরণ করিয়া সে-কথার বিশেষ সমর্থন করিলাম।

যাইবার পূর্ব্বে ভোস্‌লে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীখানা দেখাইতে লাগিলেন। হলের দুই পাশে সুন্দর দুই সেট সুসজ্জিত ঘর। পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে। মেঝের উপর কারুকাজ-করা গালিচা পাতা, ঘরের রংয়ের সঙ্গে পর্দ্দার রং "ম্যাচ" করা। প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া চেয়ার, টেবিল, শেল্‌ফ্। দেয়ালে কাচে বাঁধানো জরীর ফুলপাতা, মখমলের জমিনের উপর তোলা; সিল্কের সুতায় তৈরি গাছপালা, পাখী; পুঁতিতে বোনা একটি ময়ূর। ভোস্‌লে বলিলেন, এসব তাঁহার বৌদির হাতের তৈরি। এক ঘরে দেখিলাম, একটা বড় সেতার। সেখানে সেদিনের মেয়েটি বসিয়া কি ছবি আঁকিতেছিল, ও ছেলেরা বসিয়া লিখিতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সেতার কে বাজায়?"

ভোস্‌লে বলিলেন, "ওটা বৌদি বাজান। তবে শালিনীও সেতার বাজাতে পারে। তারপর মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাদেরে তোমার একটা গৎ বাজিয়ে শোনাও না, শালিনী!"

আমরা ভিতরে গিয়া বসিলাম। শালিনী একটা ফুলের চিত্র আঁকিয়া তাহাতে রং দিতেছিল। কাকার কথায় সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টির স্থৈর্য্য ও মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম। ভোস্‌লে আবার স্নিগ্ধ-কণ্ঠে তাহাকে বাজাইতে বলিলেন। শালিনী ঘরের কোণ হইতে একটি সেতার আনিয়া বসিল। ছেলেরা লেখা ছাড়িয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। শালিনী সেতারটিকে কোলের উপর লইয়া তাহার তার ঠিক করিয়া আঙুলের ঘা দিতে লাগিল।

তারপর তাহাতে একটা গৎ তুলিল। ভোস্‌লে তাহাকে গাহিতে বলিলেন। মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট কণ্ঠে একটি গান গাহিল। পূরবী রাগ্, দিবা শেষের অবসাদ-মাখা, শূন্য গোষ্ঠের রিক্ততা-ভরা!

সেই সেতারটির উপর এলাইয়া-পড়া মেয়ের সুঠাম দেহভঙ্গী, সেই তারেতে তাহার চঞ্চল অঙ্গুলিচালনা, আর মেয়ের কোমল কণ্ঠস্বর ও সেতারের মৃদু মূর্চ্ছনার সহযোগে সেই উদাস-করা, ব্যথাভরা গান আমাকে সহসা অবাক্ করিয়া দিল। এ যেন একটা প্রাচীন জাতির বহু অভিজ্ঞতা-লব্ধ, বহু তপস্যা-দগ্ধ ভাবনার তীব্র অভিব্যক্তি, তাহাতে বাল্যের চাপল্য নাই, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নাই,—যেন জীবনের শত অশ্রু, শত বেদনায় অভিষিক্ত হইয়া এ সুরের মূর্চ্ছনা নির্গত হইতেছে! সুন্দর কোমল বালিকা কণ্ঠের পূরবী রাগের গান! সেই সেতারের তারের উপর মেয়ের ছোট্ট কোমল আঙুলটির এক একটা ঘা যেন আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল!

গান শেষ হইলে আমরা নীচের ঘরে গেলাম। শুধু উপরের কোণের ঘরটা দেখা হইল না, সেখানে নিশ্চয়ই বাবুরাওয়ের বৌদি ছিলেন।

নীচের ঘর দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহাদের "দেবঘরের" দরজায় গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এদেশে বিলাত-ফেরতের বাড়ীতেও দেব-ঘর থাকে। তাহাতে গৃহ-দেবতার পূজা হয়। দুজনে বিস্মিত ভাবে পরস্পরের দিকে চাহিলাম। উপরে সুন্দর মঞ্চের উপর দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ছবি। তার সাম্‌নে মেঝের উপর একটা ইঁদুর মরিয়া পড়িয়াছিল। তার শাদা দুই পাটি ছোট ছোট দাঁত কতক বাহির হইয়া রহিয়াছিল, চোখ অর্দ্ধেক বুজিয়াছিল, লেজটা সোজাভাবে মেজের উপর বিছাইয়া পড়িয়াছিল! ঐ মসৃণ মেঝের উপর এই ক্ষুদ্র প্রাণহীন জীবটি একটা আতঙ্কের শিহরণ আনিল।

আমি বলিলাম, "এ নিশ্চয়ই প্লেগের ইঁদুর। মিউনিসিপালিটির লোক ডাকিয়া এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। আর এ বাড়ীতে এখন থাকা ঠিক নয়।"

ভোস্‌লে নিজের মনের চাঞ্চল্য চাপিয়া রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা' হস্পিটালে পাঠিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জান্‌তে হ'বে। চাকরেরা ইঁদুরের বিষ ছড়িয়ে রেখেছিল কিনা তাহারও খোঁজ করতে হ'বে।"

আমি বলিলাম, "আজকালকার দিনে সতর্ক থাকাই ভাল।"

ভোসলে বলিলেন, "তা' নিশ্চয়। তবে এক্ষণই বাড়ী পাওয়া যাবে কোথায়? আমরা ঐ মাঠে ঘাটে চালা তুলে থাক্‌তে পারব না!"

আমি বলিলাম, "বাবুরাওকে বল্‌ব, তাঁর সাহায্যে সিংপুরে বাড়ী পাওয়া যাবে।"

আমি বিদায় লইলাম। তার পূর্ব্বে নীচের বারান্দায় ছেলে দুটির সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদিগকে নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। একজন বলিল, "শ্রীধর।" অপরে বলিল, "সুরেশ।" আমি ভোসলেকে বলিলাম, "বাঙ্গালী নাম যে!"

ভোসলে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ যে নূতন যুগ!"

ভোসলে আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। গাড়ীতে যখন আবদুল হ্যাণ্ডেল মারিতেছিল, তখন একবার উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম সেদিনকার সে মহিলাটি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমার দিকে দৃষ্টি পড়াতেই একটু ঘাড় ফিরাইয়া লইলেন। সে অচঞ্চল অথচ সলজ্জ অঙ্গভঙ্গী আমাকে চমৎকৃত করিল। আমি আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার কপালে সিঁদুর নাই।

বাবুরাওকে যখন ভোসলেদের বাড়ীর খবর বলিলাম এবং জানাইলাম যে, তাঁহারা কোথায় যাইবেন জানেন না, তখন সহসা তিনি চঞ্চল হইয়া

উঠিলেন। কোথাও গাড়ীতে, কোথাও সাইকেলে লোক পাঠাইলেন। কাহারও সঙ্গে চিঠি লিখিয়া দিলেন। কাহাকেও বা মুখের কথায় সমঝাইয়া দিলেন। হঠাৎ বাবুরাওয়ের একখানা চিঠির কাগজের উপর দৃষ্টি পড়িল, কোণে লেখা ছিল "শ্রীধর সখারাম দেশাই।" আমি অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিলাম "শ্রীধর!" বাবুরাও আমার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?" আমি নিজেকে সাম্‌লাইয়া বলিলাম, "কিছু না।"

তারপর বাবুরাও খুব বৈষয়িক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাজ কি পর্য্যন্ত হয়েচে?"

আমি বলিলাম, "আগামী পরশু আমার তিন সপ্তাহ শেষ হচ্চে। সে দিনই আমার যাওয়া ঠিক। সেভাবে পুণা ও বম্বে চিঠি লিখেচি।"

বাবুরাও বলিলেন, "যদি প্লেগ না থাকৃত, তবে আপনাকে আরও থাকৃতে অনুরোধ করতাম, তবে বর্ত্তমানে তা' করা চলে না।"

ষ্টেশনে যাইবার সময় হইলে বাবুরাও বলিলেন, তিনি সে-রাত্রে কিষাণপুরেই থাকিবেন, খুব কাজ আছে। আমাকে তাঁহার গাড়ী দিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি রাত্রিতে 'প্লেগ এরিয়াতে' থাকৃবেন, এ কি রকম?"

বাবুরাও বলিলেন, "আমি 'প্লেগ-প্রুফ' হ'য়ে গেচি, মিঃ চক্রবর্ত্তী!" তারপর বলিলেন, "এ দুর্দিনে আপনাকে একাই থাকৃতে হ'বে, মিঃ চক্রবর্ত্তী! সঙ্গে ঠাকুর চাকর থাকবে, দেখবেন, আপনার খাওয়া দাওয়ার যেন ত্রুটি না হয়।"

ষ্টেশনে যাইবার পথে মনে হইল, যাইবার বেলায় বাবুরাওকে মাতাল দেখিয়া গিয়াছিলাম, অথচ এখন তো তার চিহ্নও দেখা যাইতেছে না।

সে রাত্রে সিংপুরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাবুরাওয়ের সব জিনিষপত্র আমার ঘরের বারান্দায় স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। চাকর বলিল, বাবুরাওয়ের লোক কিষাণপুর হইতে তার পাইয়া তাঁহার সব ঘর খালি করিয়াছে, এবং তারের লেখামত জিনিষগুলি আমার ঘরের পাশে আনিয়া রাখিয়াছে।

পরদিন কিষাণপুরে গিয়া বাবুরাওয়ের দেখা পাইলাম না। তিনি কাজে শহরের বাহিরে গিয়াছিলেন।

বিকালে সিংপুরে ফিরিয়া দেখিলাম, বাবুরাওয়ের ঘরগুলির জানালায় রঙিন পর্দ্দা ঝুলিতেছে। দরজায় চিক, মেঝের উপর সুদৃশ্য গালিচা দেখা যাইতেছে। হঠাৎ ভিতর হইতে হকি ষ্টীক হাতে নীল পোষাক-পরা দুইটি ছেলে ও তাহাদের পিছনে পিঠে বেণী দোলাইয়া গোলাপী শাড়ী-পরা একটি মেয়ে বাহির হইল। আমি অবাক্ হইয়া দেখিলাম, সেই ভোসলেদের ছেলে-মেয়ে, শালিনী, শ্রীধর আর সুরেশ। আমি আমার মারাঠী বিদ্যা জড়ো করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা এখানে কখন্ এলে?" বড় ছেলেটি বলিল, "আজ দুপুরে।" মেয়েটি ভিতরে গিয়া তাহার কাকাকে ডাকিয়া আনিল। ভোসলে তো বিনয় ও সৌজন্যে আমাকে অভিভূত করিয়া দিলেন। বলিলেন, তাহারা সিংপুর দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছেন। এ শহর নূতন হইয়াছে, বেশ পাহাড়ে জায়গা, আর বাড়ীখানাও খুব সুন্দর! আমি বলিলাম, "বাবুরাও প্রথম এসেছিলেন বলেই ও বাড়ীখানা পেয়েছিলেন। ওটার ওপর অনেকেরই লোভ ছিল।"

ভোসলে অবাক্ হইয়া বলিলেন, "বাবুরাও এই বাড়ীতে থাকতেন?

তা' হ'লে আমাদের জন্যে নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়েচেন! তিনি এখন থাকবেন কোথায়?"

এ-কথাটা তাঁহার জানা ছিল না দেখিয়া এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহা বাহির করিয়া দিয়া আমি অপ্রস্তুত হইলাম। বলিলাম, "পরশু আমি চলে যাচ্চি। বাবুরাও একা, আমার ঘরটাতেই থাকতে পারবেন।"

"আপনি চলে যাচ্ছেন? আমাদের জন্য নয় তো? বাবুরাও কাল কোথায় ছিলেন? তাঁর জিনিষপত্র কোথায়? আপনাদের তো খুবই অসুবিধায় ফেলেচি আমরা!" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ক্যাপ্‌টেন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, "এ পরিবারের সঙ্গে বাবুরাওয়ের কি সম্বন্ধ? কোনও কুটুম্বিতা আছে বলিয়া তো মনে হয় না!"

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। বহু হিজিবিজি স্বপ্ন দেখিলাম। বাবুরাও যেন ঠিক বাবুরাও নন, মুখটা তাঁহারই, দেহটা চীনের ড্রাগনের মত, তা' যেন ভোসলেদের বাড়ীর শিশু তিনটিকে লেজের বেষ্টনে জড়াইয়া রাখিয়াছে। সবুজ শাড়ীপরা ফুটফুটে মুখ, শালিনী যেন আমার পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। তাহার হাতে সেতার, তাহা হইতে যেন আপনাআপনি একটা করুণ গান বাহির হইয়া আমার মনকে ক্লান্ত করিয়া দিতেছে। ঘুম ভাঙ্গিবার আগে দেখিলাম, ভোসলেদের সেই কিষাণপুরের বাড়ীটা যেন আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহারই মাঝখানে জানালার ভিতর সেই মহিলাটির মুখ, তাহাতে একটা জটিল হাসি!

পরদিন সকালে কিষাণপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই দেখিলাম, বাবুরাও প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি নামিতেই আসিয়া ভোসলেদের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাড়ী পছন্দ হইয়াছে কিনা, দুধের

বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা, চাকরাণী পাইয়াছে কিনা ইত্যাদি। আমি শুধু প্রথম বিষয়ে উত্তর দিতে পারিলাম। সন্ধ্যায় বাবুরাওয়ের সঙ্গে আমার যাইবার কথার আবার আলোচনা হইল। আমি কোন্ গাড়ীতে যাইব, পুণা কখন্ পৌছিব, বম্বে কখন্ যাইব, এসব বিষয়ের খুঁটিনাটি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বাবুরাও সে রাত্রেও কিষাণপুরে রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আগামী কাল আমি সিংপুরে আস্‌চি না, আমাকে জিনিষ-পত্র গোছাতে হবে।"

বাবুরাও ধীরভাবে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে সিংপুর ষ্টেশনে দেখা হ'বে।"

আমি একটু রহস্য করিয়া বলিলাম, "বুঝেচি, আমার ঘর খালি না হ'লে আপনি সিংপুরে আস্‌চেন না? কেন, এক ঘরে দুজনে একদিনও থাকা যায় না?"

বাবুরাও সহজভাবে বলিলেন, "তা নয় মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি, আশা করি, ভুল বুঝবেন না।"

আমি বাবুরাওকে তাঁহার আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু বাবুরাও সে-সব কথায় বিশেষ সাড়া দিলেন না।

আমার মনে হইল, আমি থাকিতে বাবুরাও সে বাড়ীতে যাইতে চান না, আমি চলিয়া গেলে যাইবেন। সে পরিবারের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ, হয়ত তাহা আমার কাছ হইতে গোপন করিতে চান।

দরজার সামনে আমাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইতে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আবদুল হর্ণ বাজাইল। আমি ভাবিলাম, আমার কৌতূহল নিবৃত্তির ইহাই শেষ সুযোগ।

প্রশ্ন করিলাম, "বাবুরাও, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

বাবুরাও আমার দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "না। তা' হ'লে আপনার গাড়ী ফেল হ'বে।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "গাড়ী ফেল হোক, তবু আমি একটা কথা জানতে চাই।"

বাবুরাও মুচ্‌কি হাসিলেন। বলিলেন "কি কথা?"

"মিসেস্ ভোস্‌লে কে?"

"পরলোকগত ব্যারিষ্টার ভোসলের স্ত্রী, ক্যাপ্‌টেন ভোসলের ভ্রাতৃবধূ, কিষাণপুরের অতি প্রাচীন অভিজাত পরিবারের কুলবধূ!" বাবুরাও হাসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁর মুখ শুধু কুঞ্চিত হইয়া পড়িল।

আমি একটু থামিয়া বলিলাম, "আমি ভাবিতেছিলাম, ইনি তো সেই নন?"

"কে?"

"যাঁর কথা আপনি একদিন গাড়ীতে বলেছিলেন!"

বাবুরাও চঞ্চলভাবে বলিলেন, "তা' আপনি কি করে জান্‌লেন? তাঁরা কিছু বলেচেন?"

আমি বলিলাম, "তাঁরা কি বলবেন? ও আমার অনুমান মাত্র।"

"অনুমান?" বলিয়া বাবুরাও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন।

আমি একটু তরলভাবেই বলিলাম, "এঁর সম্বন্ধেই পাটনে রাও-সাহেব ও আপনার ঝগড়া হয়েছিল?"

বাবুরাও আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। বলিলেন, "পাটনে বলেচে নিশ্চয়!"

আমি অবাক্ হইয়া বাবুরাওয়ের দিকে চাহিলাম। বলিলাম, "পাটনে এঁদের বিষয় জানবেন কি করে ?"

বাবুরাও কিঞ্চিৎ থামিলেন। তাঁহার মুখের কুঞ্চিত ভাব কতকটা কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী !"

"কি ?"

"আপনি বাস্তবিকই এ বিষয়ে কারো কাছে কিছু শোনেন নি ?"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "না।"

বাবুরাও স্থিরভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এই সেই !"

তখন আবদুল আসিয়া বলিল, "ট্রেণের পাঁচ মিনিটও সময় নেই।" আমি মোটরে গিয়া উঠিলাম। ষ্টেশনে যখন গেলাম তখন ট্রেণ ছাড়িতে উদ্যত। ছুটিয়া গিয়া আমাদের কামরাতে চড়িলাম।

সে-রাত্রে নির্সী ষ্টেশনে যখন যাত্রীরা কামরা হইতে নামিয়া গেলেন, তখন প্রত্যেকে আমাকে শুভ ইচ্ছা জানাইলেন। বৃদ্ধ নির্সীকর আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভাউসাহেব জোরে হ্যাণ্ডশেক করিয়া কার্য্যে সাফল্য ইচ্ছা করিলেন। বাপুসাহেব ও পাটনে-রাওসাহেব 'আবার দেখা হইবে' বলিয়া আশা প্রকাশ করিলেন। উদ্‌গাওকর প্রীতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন, তিনি শুনিয়াছেন, বাবুরাও নাকি কিষাণপুর ছাড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার কাজ সব শঙ্কর মিস্ত্রি আর আফ্‌তাপ আলিকে দিয়া ফেলিয়াছেন ! আমি শুধু অবাক্ হইয়া তাহা শুনিলাম।

সে-রাত্রে ফিরিবার পথে কনডলে ষ্টেশন হইতে বৃদ্ধ ক্যাথলিক আফিস-ইনস্পেক্টর উঠিলেন। বাকি আধঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে প্লেগের কথা, কলিকাতার কথা, মাদ্রাসের কথা ও অবশেষে ক্যাথলিক ছাত্রের প্রতি প্রোটেষ্টাণ্ট শিক্ষকের বদ্‌নজরের কথা হইল।

সিংপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই ভোসলেদের চাকর আসিল। সে আমার হাত-ব্যাগটি লইয়া চলিল।

সেদিন প্রাতে কিষাণপুর যাইবার পূর্ব্বে ভোসলে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে রাত্রিতে খাবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে আহার করিতে করিতে অনেক খোস্-গল্প হইল। অবশেষে আমি তাঁহাকে চাকরাণী ও দুধের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "বাবুরা ওয়ের লোকে উভয়েরই সুবন্দোবস্ত করেচে। বাবুরাও আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেচেন!"

খাবার পর ভোস্‌লে আমার ঘরে আসিয়া নানা গল্প করিতে লাগিলেন। আমি আনন্দের সহিত তাহা শুনিতে লাগিলাম। আমার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল, তাহা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। হঠাৎ বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, অপর দিকের বারান্দায় মিসেস্ ভোসলে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন, তার পাশে শালিনী চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ের উপর মুক্ত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের পেছনে অস্পষ্ট পাহাড়-রাশি জ্যোৎস্নার স্পর্শে এক অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে এক একবার বাহিরের দিকে চাহিতেছিলাম, আর দেখিতেছিলাম, সেই ধূসর পাহাড়-রাশিকে পেছনে রাখিয়া উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে মেয়ে মায়ের গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ের শুভ্র বসন জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝলসিয়া উঠিতেছে।

ভোসলে চলিয়া গেলে আমি কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বারান্দায় দেখিলাম, শালিনী চলিয়া গিয়াছে, মিসেস্ ভোসলে একা রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জ্যোৎস্নায় অতি অস্পষ্ট-ভাবে তাঁহার মুখ দেখা যাইতেছে; তাঁহার দেহ স্থির, নিস্পন্দ;

দৃষ্টি বোধ হয় ঐ জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছিল।

আমি দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, কাল হইতে বাবুরাও এ বিছানায় শুইবেন, আমি থাকিব বম্বের পথে! বাবুরাও একদিন এ মহিলাটিকে ভালবাসিয়াছিলেন, হয়ত আবার ভালবাসিবেন। তখন শালিনী ও-ভাবে আসিয়া মায়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কি?

তার পরদিন সিংপুরে আমার শেষ দিন। প্রভাতে পাহাড়ের উপর যখন সমতল ভূমির আধঘণ্টা আগেই কোমল রোদ ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। তার পূর্ব্বেই ভোসলে-পরিবার উঠিয়াছিলেন। প্রভাতে স্মিত-মুখে ক্যাপ্টেন আমাকে সুপ্রভাত জানাইলেন ও চা খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। চা-ঘরে গিয়া দেখিলাম, তাঁহার বৌদিও সেখানে। তিনি ছেলে-মেয়ে সহ আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়াই চা খাইলেন। আমার সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা-সূচক দুচারটা কথা হইল। তিনি সুন্দর ইংরাজী বলেন। তাঁহার কথার ভিতর এমন একটা সৌজন্য মেশানো ছিল, যাহা শুধু অনুভব করা যায়—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; যেন ফুলের সৌরভের মত, সে প্রভাতের রৌদ্রের মৃদু আভার মত।...

শালিনী গতদিনের আঁকা ছবিখানি মাকে আনিয়া দেখাইল। তিনি আমাকেও তাহা দেখাইলেন, বলিলেন "বম্বেতে রীতিমত ওয়াটার পেন্টিং শিক্ষা দেওয়া হ'ত, এখানে তা' হ'বার সম্ভাবনা নেই।"

আমি বলিলাম, "তবে এখানে নেচার ষ্টাডি করবার সুযোগ পাবে।"

মিসেস্ ভোসলে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সুযোগ পেলেই তো হ'ল না, ষ্টাডি করতে প্রথম শেখা চাই!" হাসির মধ্যে স্থৈর্য্য ও

মাধুর্য্যের এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সুন্দর ফুলটি আঁকিয়াছিল শালিনী। তাহা খুব বাস্তব ধরণের নয়, তবে প্রত্যেকটা রেখাপাতের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। শালিনী এগারো বারো বছরের মেয়ে, মায়ের চেয়ারের পাশে সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কপালে অতি ছোট একটি সিঁদুরের টিপ ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল।

দুপুরের গাড়ীতে বাবুরাওয়ের লোক আসিল। ঘর-দরজা ঠিক-ঠাক করিতে লাগিল, জিনিষ সব গুছাইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, আজ আমি, কাল হইতে বাবুরাও ঐ ঘরের বাসিন্দা!···তা'তে কি? তবু যেন মনে কেমন ঈর্ষা জাগিতেছিল।

লোকটি বলিল, বাবুরাও সন্ধ্যার গাড়ীতে দূরে কোথাও যাইবেন, সিংপুর নামিবেন না। তাহাকে বাবুরাওয়ের বিছানা ট্রাঙ্ক ইত্যাদি ষ্টেশনে লইয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুরাও কোথায় যাবেন?"

লোকটি বলিল, "তিনি কোথায় যাবেন, বলেন নাই।" বাবুরাও ব্যবসা উপলক্ষে সর্ব্বদাই এখানে সেখানে গিয়া থাকেন।

বিকাল হইল, সন্ধ্যা ঘনাইল, আমার যাইবার সময় নিকট হইয়া আসিল। ক্যাপ্‌টেন তো আমাকে এক রকম পাইয়াই বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, আবার এদিকে আসিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অতিথি হইতে হইবে, কলিকাতা যাইতে যেন মধ্যভারতের পথে যাই ও তাঁহার কাছে হইয়া যাই, ইত্যাদি। ছেলেরা উঠানে খেলিতেছিল, ছোট্ট কালো কুকুরটা ছুটিয়া ছুটিয়া মুখে করিয়া বল আনিয়া দিতেছিল।

তখন যদি আমাকে বলা হইত, 'তুমি কি পাইলে সবচেয়ে সুখী

হও ?' তবে আমি কি চাহিতাম ? শালিনী একটা গান গাহিয়া শুনাক্, না মিসেস্ ভোসলে মেয়ের ওয়াটার কালার পেন্টিং শিখার কথাটা তেমনই সৌষ্ঠবের সহিত আবার বলেন ? না, ক্যাপ্টেন ভোসলের আর একটা গল্প ? না, ঐ ছোট্ট, কালো মিশমিশে, লম্বা লম্বা লোমওয়ালা 'পমারেনীয়ান' কুকুরটা ?...

সূর্য্য পাহাড়ের কোলে ঢলিয়া পড়িল। আকাশের গায়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শেষ জ্যোতিটি লাগিয়া রহিল। আমি আমার সমস্ত গোছানো সমাপ্ত করিলাম।

তারপর ষ্টেশনে রওয়ানা হইলাম। ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে আসিলেন। কালো কুকুরটাও তাঁহার সঙ্গ লইল। ছোট্ট ষ্টেশন, লোকের ভিড় নাই। ট্রেণে বাবুরাও আসিলেন। সে-ষ্টেশনে ট্রেণ অতি অল্প সময় থামে। ভোসলে বাবুরাওকে খুব ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার ও আমার সঙ্গে হৃদ্যতার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতদূর যাচ্ছেন ?" বাবুরাও বলিলেন, "পুণা"।

"শিগ্ গিরই ফিরচেন্ তো ?"

"তা ঠিক বল্‌তে পারি না।"

ভোসলের চাকর আমাদের কামরায় এক ঝুড়ি খাবার আনিয়া রাখিল। বলিল, "মাঈ-সাহেব দিয়াছেন।"

বাবুরাওয়ের লোক তাঁহার ও আমার মাল-পত্র ব্রেকে উঠাইল। গাড়ী সিংপুর ত্যাগ করিল।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাবুরাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সে কামরাতে আর কোনও প্যাসেঞ্জার ছিল না। কামরাখানি অতি মূল্যবান্ বিলাতী মদের সৌরভে আমোদিত হইয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পর বাবুরাও কথা বলিলেন। তাঁহার স্বর ভারী, মনে

হইল, পানটা একটু অধিক মাত্রায় করিয়াছেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আশা করি, আপনি কিষাণপুরের মিউজিয়াম হ'তে যে সব বিষয় সংগ্রহ করবেন ব'লে স্থির করেছিলেন, তা' সংগ্রহ করতে পেরেছেন ?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ।"

বাবুরাও বলিলেন, "দেখ্‌বেন, তা যেন লিখে শেষ ক'রে ফেলেন। আশা করি, আপনার পরিশ্রম সার্থক হবে।"

আমি মাথা নাড়িলাম।

বাবুরাও আবার বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দুদিকে মাঠ ও জ্যোৎস্না-প্লাবিত পাহাড় অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমাদের কামরার মাঝখানে গ্যাস্ লাইট উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। জানালা দিয়া তার আলোক জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া গলিয়া পড়িতেছিল। গ্যাসালোকের কাচের নীচে গুটিকতক পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং এক একবার কাচে গিয়া ধাক্কা খাইতেছিল।

আমি বাবুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি পুণায় কয়দিন থাকিবেন এবং কবে ফিরিবেন।

বাবুরাও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা' বল্‌তে পারি না। নিশ্চয়ই শিগ্‌গির নয়।"

আমি বলিলাম, "শুনচি আপনি কাজ গুটিয়ে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ?"

"কে বল্লে ?"

আমি উদ্‌গাওকরের নাম করিলাম। বাবুরাও বলিলেন, "বর্ত্তমানে তাই সঙ্কল্প করেচি। আপনি এতে নিশ্চয়ই অবাক্ হয়েচেন ?"

"নিশ্চয়! ক্যাপ্‌টেন ভোসলেরাও খুব অবাক্ হ'বেন, কেননা, তাঁদের আমি বলেচি আপনি আমার ঘরটায় গিয়ে থাকবেন।"

বাবুরাও চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আপনি একথা বলেচেন ? তারা কি বল্লেন ?"

আমি বলিলাম, "কিছু না।" তারপর বলিলাম, "তাঁরা আপনার সাহায্যের জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি তো বেশ লোক, নিজের বাড়ী পরকে দিয়ে দেশান্তরে চলেছেন !"

বাবুরাও বলিলেন, "তা' না করলে বিধাতাকে প্রলুব্ধ করা হ'ত !—We should not tempt Fate !"—তাঁহার কথার স্বরে মাতলামির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

আমি বলিলাম, "তার মানে ?"

বাবুরাও হঠাৎ প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি বাঙালী, আমার বন্ধু বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি মিত্রের স্বজাতি। আজ আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। যে-কথা গত পনর বৎসর যাবৎ জগতে কেউ জান্‌তে পারে নি, আজ আপনার কাছে তা' খুলে' বলব।"

আমি বলিলাম, "কি সে কথা বাবুরাও ?"

বাবুরাও বলিলেন, "একদিন এ-গাড়ীতে, এই কামরাতে বসেই আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি জীবনে কাকেও ভালবেসেছি কি না। আমি আপনার কাছে সুমিত্রার কথাই বলেছিলাম। সেদিন জান্‌তাম না, সে দশ বৎসর পরে আবার আমার সংস্পর্শে আস্‌বে।"

আমি বলিলাম, "মিসেস্ ভোসলে ?"

বাবুরাও বলিলেন, "হ্যাঁ, সুমিত্রাই মিসেস্ ভোস্‌লে হয়েচে। ছেলেবেলায় তাদের আমাদের পাশাপাশি বাড়ী ছিল। সে আমার কাছে লেখা-পড়া শিখ্‌ত, দুনিয়ার সব খবর জিজ্ঞাসা কর্‌ত। আমি তার এক গুরু ঠাওরেছিলাম।—আমি জান্‌তাম, সে তার প্রথম যৌবনের নির্ম্মল

হৃদয়টি দিয়ে আমায় ভালবাস্‌ত। কিন্তু অসময়ে আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। সে পড়াশোনা করতে লাগ্‌ল, তার কিছুকাল পরে আমি আমেরিকা গেলাম। ফিরে এলে পরে আবার দুজনার মধ্যে যে কেমন করে পূর্ব্বভাব ফিরে এল, তা' আমি জানতেও পারলাম না।"

বাবুরাও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সে যে আমাকে কত ভালবাস্‌ত, আর আমি তাকে কত ভালবাস্‌তাম, সে কথা বুঝ্‌তে পারলাম তখন, যখন সে-বোঝার কোনও সার্থকতা রইল না। আমেরিকা থাক্‌তেই আমার পত্নীবিয়োগ হয়—আমার ছেলেবেলায় বিয়ে করা স্ত্রী, যার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি। আমেরিকা হতে ফিরে এসে ইচ্ছা করলেই আমি সুমিত্রাকে বিয়ে করতে পারতাম, কিন্তু কাজের ভিড়ে সে কথাটা সে-রকম করে ভাবি নি। এক বছর গেল, দুবছর গেল,—আমি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও, তা'কে পেতে চাইলাম না। অবশেষে সে বিয়ে করলে ব্যারিষ্টার ভোস্‌লেকে।"

তারপর আবার বলিতে লাগিলেন, "বিয়ের পর সে বম্বে চলে গেল। তখন আমার জীবনে যে তার কি স্থান, তা' বুঝতে পারলাম।"

আমি বলিলাম "ইনিই পাটনে রাওসাহেবের বিষয়ে আপনার মত শুনে' হেসে কুটি কুটি হয়েছিলেন ?"

বাবুরাও বলিলেন, "হ্যাঁ। সুমিত্রা প্রথম জীবনে খুব হাস্য-প্রবণ ছিল।—বিয়ের পর প্রথম তিন চার বছর কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েচে, তবে একটি কথা বিনিময়ও হয় নি ! এত বৎসর পর ঘটনাচক্রে সে আবার আমার পথে এসে পড়েচে ! ঘটনার চক্র কেমন নির্ম্মম, মিঃ চক্রবর্ত্তী !"

বাবুরাওয়ের প্রতি আমার চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "তা' হ'লে এতকাল আপনি তাঁকে ভালবেসে এসেচেন ?"

বাবুরাও নিরুত্তর রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। সেখানে যখন সে এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে অতি সাবধানে পা ফেল্‌তে হয়, মিঃ চক্রবর্ত্তী !"

আমি তরলভাবে বলিয়া গেলাম, "বাবুরাও, ভালবাসাকে আপনি ভয় করেন ? জগতে ভালবাসার চেয়ে সুন্দর জিনিষ আর কি আছে ?"

বাবুরাও বিষণ্ণভাবে হাসিলেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি ছেলেমানুষ। ভালবাসা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই শুধু বইয়ে পড়েচেন। তার জীবন্ত স্বরূপ যে কি, তা' প্রত্যক্ষ করেন নি।"

আমি বলিলাম, "তিনি আপনাকে ভালবাসেন ?"

বাবুরাও কিছুকাল গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, "তা' আমি জানিনে, জানতে ইচ্ছাও করি নে। মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি ওসব অভিজাতদের বিষয় জানেন না, মনে হয় ?"

"কি রকম ?"

"তাদের পুরুষেরা এমন পাপ নেই যা' না করবে, এমন নীচতা নেই যা' থেকে মুখ ফিরে দাঁড়াবে। এ ভোস্‌লে পরিবারের দুটা জারজ শাখা আছে, তা' জানেন ?"

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম, "না !"

বাবুরাও বলিলেন, "আমার মিস্ত্রীকে জানেন, ঐ যে ছুতোরের কাজ করে,—সেও ভোস্‌লে, তাদেরই বংশের শাখা—"

আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করিতে যাইতেছিলাম। বাবুরাও বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাদের মেয়েদের দেখুন, বংশানুক্রমে

সেই পর্দ্দার আড়ালে জীবন কাটাচ্চে! কি সংযম, কি কঠোরতা তাদের ভিতর! তারা যখন সমাজে বেরোয়, তখন লোকে দেখে তারা গর্ব্বিতা, তারা তাদের পোষাকে গয়নায় সবাইয়ের চোখে তাক লাগিয়ে দেয়,—কিন্তু তাদের প্রাণের খবর ক'জনে রাখে? যদি রাখত, তবে জান্‌ত, সে-প্রাণ সে-আভিজাত্যের চাপে কেমন হাঁপিয়ে ওঠে; কিন্তু তবু তারা সে আভিজাত্যের গর্ব্ব দিয়েই নিজেদেরে আগলে' রাখে!"

বাবুরাওয়ের মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। তিনি নেশার ঘোরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ওসব মেয়েমানুষের প্রেম মানে আপনার ঝি, চাকরাণী, বোষ্টুমীর প্রেম নয়, যে 'হ্যাঁ' করতেই 'হুঁ' করে উঠবে, চাওয়া মাত্রই নিজেকে বিলিয়ে দেবে! না মিঃ চক্রবর্ত্তী, তা' যদি হ'ত, তবে আজ ছ'বছর পরে সুমিত্রা আমার দিকে ওরকম নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চাইত না!"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "কিন্তু তিনি তো আপনাকে প্রথম জীবনে খাঁটিভাবে ভালবেসেছিলেন! আপনি বোধ হয় জানেন যে, তাঁর বড় ছেলেকে আপনার নাম দেওয়া হয়েচে। সেটার নিশ্চয়ই অর্থ আছে।"

বাবুরাও মাথা তুলিয়া স্থিরভাবে আমার দিকে চাহিলেন, তারপর কাঁপাস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, সুমিত্রা আমাকে ভালবেসেছিল একথাটা যত সত্য, সে আমায় আবার ভালবাসবে এরূপ আশা করাটা তেমনই মিথ্যা! আমি তা'কে ছেলেবেলা হ'তে জানি, সে সে-জাতের মেয়েই নয়!"

আমি সমালোচনার সুরে বলিলাম, "মেয়েদের মধ্যে আবার জাত আছে নাকি?"

বাবুরাও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ভাঙ্গা গলায় বলিয়া যাইতে

লাগিলেন, "নিশ্চয়! জগতে দুরকম মেয়ে-মানুষ আছে, মিঃ চক্রবর্ত্তী! এক রকম প্রজাপতির মত, তারা সুন্দর, তারা বিলাসপ্রিয়, তারা চঞ্চল, আনন্দশীল! রূপ যৌবন তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা' দিয়ে তারা জগৎকে পায়ের তলায় টেনে আন্‌তে চায়।—তাদের নিয়েই জগতের সব কাব্য উপন্যাস তৈরি হয়। তাদের হাসিতে ফুল ফোটে, অশ্রুতে মুক্তা ঝরে, গতিতে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগে।

"আর একরকম মেয়ে-মানুষ আছে, তারা পাখীর মত। পাখীরা দেখবেন, দিনের পর দিন ঠোঁটে করে খড়কুটা নিয়ে আসে, নিরাপদ দেখে একটা কোণ খুঁজে নেয়, সেখানে বাসা বাঁধে। বাসাটাই এদের জীবনের কেন্দ্র, তা' রক্ষা করবার জন্যে প্রবল শত্রুর সঙ্গেও ক্ষুদ্র ডানা দুটি মেলে' লড়বে; শত্রুর পাখার দাপটে সে ডানার সরু হাড় ভেঙ্গে যাবে, রক্তে রক্তাক্ত হ'বে, তবুও সে বাসাটি ছেড়ে যাবে না। সে মেয়েমানুষেরাও তেমন। গৃহই তাদের জীবনের কেন্দ্র। গৃহের জন্যে তারা নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। সূর্য্য-কিরণের মধ্যে যেমন রামধনুর সাতটা রংই লুকিয়ে থাকে, তাদের প্রাণের ভিতরও তেম্‌নি জীবনের কাব্য, আর্ট, রোমান্স সব মিলিয়ে যায়, বাইরে শুধু একটা শুভ্র তেজ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আপনাদের কবি আর্টিষ্টের চক্ষে এরা গদ্যময়। এদের জীবনে চাঞ্চল্য নেই, বৈচিত্র্য নেই, ব্যভিচার নেই, ডাইভোর্স নেই,—এরা একটা আদর্শ, একটা কল্পনাকে সম্বল করে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেয়!"

বাবুরাও ক্ষণেক থামিয়া আমাকে নীরব দেখিয়া, আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, মেয়েদের মধ্যে, ব্রাহ্মণ, মারাঠা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, ইংরেজ, ইয়াঙ্কি, এ-সব ভেদ নেই, তারা সব এক; ভেদ আছে শুধু ঐ দুই জাতের।"

বাবুরাওয়ের কথা শেষ হইলে আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বাবুরাও মুখ ফিরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। দূরে পাহাড়-শ্রেণী জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া রহিয়াছিল।

তারপর পকেট হইতে দিয়াশলাই ও বিড়ি খুলিয়া বহুক্ষণ নিবিষ্ট-ভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

আমি ঝুড়ি খুলিয়া ভোসলের বাড়ী হইতে দেওয়া খাবার উভয়ের মধ্যে বাঁটিয়া লইলাম। বাবুরাও রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি খান, আমি পরে খাব'খন।"

আমার খাওয়া হইলে বাবুরাও ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "রাত্রি এগারোটা হয়েচে, এবার ঘুমিয়ে পড়ুন, মিঃ চক্রবর্ত্তী।"

আমি শুইয়া পড়িলাম, এবং সত্বরই ঘুম আসিল। তারপর এক একবার ঘুম ভাঙিলে চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইতাম, খোলা জানালার পাশে বসিয়া বাবুরাও একান্তমনে বিড়ি টানিতেছেন, আর যেন দূরের ঐ জ্যোৎস্নাস্নাত পাহাড়মালার মধ্যে তাঁহার মন ডুবিয়া আছে।

প্রভাতে বাবুরাও আমাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিলেন। গাড়ী তখন পুণায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কুলি ডাকিয়া মাল দিলেন। রাত্রির অভুক্ত মিষ্টিগুলি ঝুড়িতে তুলিয়া লইলেন।

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, চলুন্ একবার গরম চা খাওয়া যা'ক।" আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, চোখের আরক্ত ভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। মদের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়া বাবুরাও চা, টোষ্ট, বিস্কিট সব একে একে অর্ডার দিতে লাগিলেন, এবং দৃঢ় হস্তে সে সব একের পর এক গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন।

সে হলটাতে আরও অনেক লোক বসিয়া খাইতেছিল।

আমি বলিলাম, "বাবুরাও, তা' হ'লে আপনি সিংপুরে বা কিষাণ-পুরে শিগ্‌গির ফিরচেন না ?"

বাবুরাও অতি বুভুক্ষুভাবে মাখন ও জ্যাম মাখা একখানা টোষ্ট গিলিয়া বলিলেন, "সে কথাই কাল সারারাত ধরে ভেবেচি। আমার একটা ভারি দুর্ব্বলতা আছে, মিঃ চক্রবর্ত্তী। একটু বেশী পান করলে মনটা অতিরিক্ত রকম sentimental (ভাবপ্রবণ) ও idealistic (কল্পপন্থী) হ'য়ে পড়ে! ওসব আইডিয়ালিজম্ কিছু নয়! জীবন যখন যে দিকে চলে, চলবে; তাকে নিয়ে অত টানা-হেঁচড়া করে লাভ কি ?"

আমি অবাক্ হইয়া বাবুরাওয়ের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, পানের দোষ কাটিয়া গিয়া তাঁহার চোখ দুটি নিস্তেজ, নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার বহুরেখা-বিশিষ্ট কপালটি কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, "উদ্‌গাওকর বলেছিল, আপনি সব ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেচেন ?"

বাবুরাও বৈষয়িক ভাবে বলিলেন, "ব্যবসা আবার গুটানো কি ? হাতের দুচারটা কাজ অন্যকে দিয়েচি। আজকাল 'ডিপ্রেশনের' দিনে ব্যবসাই বা কি !"

বাবুরাও মুচকি হাসিলেন। সে হাসিটির মধ্যে যেন তাঁহার সমস্ত সাংসারিক অভিজ্ঞতা মূর্ত্তি গ্রহণ করিল !

কাল রাত্রিতে, নেশার ঘোরে, বাবুরাও ছিলেন কবি, ভাবুক, কল্পলোকের অধিবাসী; আজ প্রভাতে, নেশা কাটিয়া গিয়া, তিনি আবার নিপুণ, কর্ম্মঠ, প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, নেশার সঙ্গে সঙ্গে শুধু উত্তেজনা কাটিয়া যায় নাই, সমস্ত ভাব-প্রবণতা, আইডিয়ালিজম্ চলিয়া গিয়াছে !

আমি বলিলাম, "সিংপুরে আপনি আমার ঘরটায় তো বেশ সুবিধামতই থাকতে পারেন ?"

হঠাৎ বাবুরাওয়ের মুখ জটিল হইয়া পড়িল। চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলিল। যেন বলিতে চাহিলেন, "তোমার মত ছোকরার এটুকু সামান্য চালাকি আমি আর বুঝি নে !"

রিফ্রেশমেণ্ট রুম হইতে আমরা উভয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিলাম। আমি বম্বে মেলে উঠিয়া বসিলাম। বাবুরাও দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন পুণা-প্রবাসী আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন,—পূর্ব্বে তাঁহাকে খবর দিয়াছিলাম। আমি বাবুরাওয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলাম। বাবুরাও তাঁহার পোষাক দেখিয়া প্রথম ভাবিয়াছিলেন তিনি মহারাষ্ট্রী। যখন জানিলেন তিনি বাঙালী, তখন খুব হৃদ্যতার সহিত তাঁহার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,— "বাঙালীর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়। নিউইয়র্কে বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি—"

গাড়ীর সিটি পড়িল। বাবুরাও বাক্যটা শেষ করিয়া বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গেও মাস খানেক বেশ কাট্‌ল। প্লেগের জন্য তিনি আর থাকৃতে পারলেন না, থাকৃলে—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "বাবুরাও, তা হ'লে আপনি কবে সিংপুর ফিরচেন ?"

বাবুরাও বলিলেন, "ও-বিষয়ে এত ব্যস্ততা কেন ?"

আমি বলিলাম, "সন্ধ্যায় আবার মত বদ্‌লে যেতে পারে !"

বাবুরাও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না, মিঃ চক্রবর্ত্তী, আমি সঙ্কল্প করেচি, আর মদ স্পর্শও করবো না !"

আমার বন্ধুটি অবাক হইয়া চাহিলেন। আমিও চক্ষু বিস্ফারিত

করিয়া বাবুরাওয়ের মুখের দিকে চাহিলাম। গাড়ী ছাড়িল। বাবুরাও হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, এবং যতদূর দেখা যায়, আমার দিকে চাহিয়া রুমাল উড়াইতে লাগিলেন।

আমার মনে হইল, রুমালটা যেন নাচিয়া নাচিয়া বলিতেছে, "আজই সিংপুরে যাব, তোমার ঘরটাতেই থাক্‌ব। নেশার ঘোরে ত্যাগকে ভোগের চেয়ে বড় করে দেখেছিলাম, আভিজাত্যকে ও মাতৃত্বকে অপরাজেয় মনে করেছিলাম! এখন হ'তে আমি মাতাল নই, ভাবপ্রবণ নই; আমি sober (স্থির-চিত্ত)! আমি প্র্যাক্‌টিকাল!"

কিষাণপুরের সেই তাম্রলিপির নকলগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে কত সব স্মৃতি মনে আসে। আবার যদি শীঘ্র সেখানে যাই, তবে প্রথম গবেষণার বিষয় হইবে, শালিনী ওয়াটার-কলার পেন্টিংএ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আর সে এখনও সন্ধ্যাবেলায় আগেকার মত, মায়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিনা!

রক্তের টান

"ধ্যাৎ!"

দাক্ষিণাত্যের একটি বৃহৎ হাঁসপাতাল-সংলগ্ন মেডিক্যাল ছাত্রাবাসের ভোজন-গৃহে একদিন বেলা দশটায় এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক তাহার সম্মুখের ভাতের থালাতে একটা ধাক্কা দিয়া হঠাৎ টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। যাইতে যাইতে আপন মনে বলিতে লাগিল, "এ দেশেও মানুষ থাকে, এ সব খাওয়া খেয়েও বাঁচা যায়?"

পার্শ্বে দণ্ডায়মান ম্যাঙ্গলোরি রসুয়ে সে ভাষা বুঝিল না কিন্তু যুবকের মুখভঙ্গী দেখিয়া অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার সযত্ন-রন্ধিত ভাজি, রসম্ এবং আমটি কেন যে ঐ ভাবী ডাক্তারের রসনা তৃপ্তি করিতে অক্ষম হইল, তাহা সে কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না।

যুবকের রং কিছুটা ফর্সা, ঠোঁট পাতলা, তবে চোয়াল দুটি ভারী ও মজবুত। মাথার চুল উল্টানো, তার উপর শোলা হ্যাটের দাগ।

অঙ্গভঙ্গীতে মনে হয়, বেশ চালাক-চতুর, "স্মার্ট।" চোখের মৃদু উজ্জ্বলতা আর অন্য প্রদেশের প্রতি ন্যক্কার ভাব তাহার বাঙ্গালীত্ব ঘোষণা করে! বাংলা ভাষার টান পদ্মার পূর্ব্বতীরের পরিচয় দেয়। তবে সে যে ক্রিশ্চ্যান, একথা কেহই কল্পনা করিতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না শুনিবে যে তাহার নাম, পল স্যামুয়েল জি মোহান। 'পলটা' বাস্তবিক তাহার ক্রিশ্চ্যান নাম নয়, পদবী,—'পালের' রূপান্তর। 'জি' গিরীন্দ্রের সংক্ষেপ। 'মোহান' মোহনের ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ। এখনও বাঙ্গালীতে নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে, "শ্রীগিরীন্দ্রমোহন পাল", কিন্তু মিশনরি সমাজে ও বাংলার বাহিরে সে পি, এস, জি, মোহান নামেই পরিচিত। হয়ত কালক্রমে তাহার বংশধরেরা যদি রংয়ের কতক পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তবে নিজেদেরে সদ্য ইউরোপ হইতে আগত মোহান পরিবার বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না,—অবশ্য যদি ততদিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় হওয়া লাভজনক ব্যাপার থাকে। তবে মোহান এখনই রেলের ইউরোপীয় তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করে। একবার পরিধানে ধুতি ছিল, তাহা দেখিয়া পাশের এক বুড়ী মেম যখন গার্ডকে ডাকিয়া দেখাইল এবং গার্ড তাহাকে সেখানে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন মোহান শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলিল, "আমি ইউরোপীয়ান" এবং সে-কামরা ত্যাগ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। গার্ড ষ্টেশনমাষ্টার সহ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মোহান ইতিমধ্যে প্যাণ্ট ও হ্যাট পরিয়াছে। ষ্টেশনমাষ্টার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে গম্ভীর ভাবে বলিল "পল স্যামুয়েল জি মোহান।" বুড়ী মেম তখন খুবই অপ্রস্তুত হইয়াছিল।

ভোজন-গৃহ হইতে নিজঘরে আসিয়া মোহান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল। চুল ব্রাস করিল না, টাই পরিল না,

লেক্‌চারে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল না। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল, সেই বাংলা দেশ, কি আরামের, কি সুখের,—আর কোথাকার এ সৃষ্টিছাড়া দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! এরি নাম ডাল? এরি নাম তরকারী? এরি নাম টক? ছি! ছি! বিরক্তিতে মোহানের সমস্ত মন তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, বাংলার সেই ইলিশ মাছের ঝাল, সেই কইমাছ আর ফুলকোপির ঝোল! সেই পটোলের ডালনা! সেই মসূর ডাল,—বিশেষ করিয়া বরিশালের মসূর ডাল! মোহান ভাবিল, সেও দেশ আর এও দেশ!

ভাবিতে ভাবিতে সেই বহু মৎস্য-শালিনী, বহু আনাজ-পরিপূর্ণা, সুজলা, সুফলা বঙ্গভূমির জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দুই তিন বারের চেষ্টাতেও টেবিলের গ্রাস মাথায় উঠিল না, খুঁটির টাই খুঁটিতেই রহিল। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে দশটা অতিক্রম করিয়া গেল। মোহান আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার মুখখানা একেবারে মুষ্‌ড়িয়া গিয়াছে! নিজের প্রতি নিজের দয়া হইল।

কিন্তু হঠাৎ তাহার ভারি চোয়াল দুটি শক্ত হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষুর দৃষ্টি কঠিন হইল। মোহানের মনে হইল, আহারে অপূর্ণতার জন্য তাহার দেহের গ্ল্যাণ্ডগুলির আভ্যন্তরীণ রসনিঃসারণ হইতেছে না, তাই তাহার চিত্ত এভাবে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে! ভাবিল, হয়ত তিন বৎসর পরে পরীক্ষা পাশ করিয়া দেশে যাইবে, কিন্তু ততদিনে তাহার সমস্ত গ্ল্যাণ্ডের 'ইন্‌টার্‌নেল্‌ সিক্রেশন্‌' বন্ধ হইয়া যাইবে, আর তার ফলে তাহার সমস্ত প্রফুল্লতা, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সমস্ত উদ্যম চলিয়া যাইবে, তাহার স্বভাব সংগ্রামের প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিবে। তখন হয়ত বসিয়া বসিয়া শুধু ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখিবে, অথবা নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক হইবে, অথবা মস্ত ধার্ম্মিক হইয়া শুধু দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে থাকিবে!

ব্রাস ও টাই রাখিয়া মোহান শুধু ভাবিতে লাগিল, গ্ল্যাণ্ডগুলিকে কি করিয়া অবনতির পথ হইতে রক্ষা করা যায়, কি করিলে তাহাদের স্বাভাবিক রসনিঃসারণ হয়। কিছুক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, সেদিন সন্ধ্যা হইতে শুধু রুটি আর মাংস খাইবে, আর কিছুই খাইবে না, সে রুটি গমেরই হোক, জোয়ারীরই হোক, আর বাজরীরই হোক। পূর্ব্বের খানা হইতে শুধু ঘোলটুকু লইবে। যদি দরকার হয়, তবে সিগারেট ছাড়িয়া দিয়া পয়সা বাঁচাইবে।

মোহান ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, এগারটা বাজিবার আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী। তখন সে চুলও ব্রাস করিল না, টাইও পরিল না, মাথায় হ্যাটও দিল না, এমন কি, দরজায় তালা পর্য্যন্ত লাগাইল না;— ছুটিয়া হস্পিটালের অভিমুখে চলিল।

২

মোহান মেডিক্যাল স্কুলের লেক্‌চার গ্যালারীর সিঁড়িতে পা দিবে, এমন সময় পেছন হইতে একজন কম্পাউণ্ডার ডাকিয়া বলিল, "হ্যালো ডাক্তার, রক্তের অভাবে একটা 'কেসের' অপারেশন হচ্চে না, তোমাদের কারো কাছ থেকে মিল্‌বে কি ?"

এখানে সকলেই ডাক্তার, ; এমন কি সুটপরিহিত আগন্তুক মাত্রকেই 'ডাক্তার' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। তবে আজকাল সাহিত্যদর্শনেরও 'ডাক্তার' আছে, তাই সংজ্ঞাটার একেবারে অপলাপ হয় না।

মোহান সিঁড়িতে উঠিল না। কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করিল, "অপারেশন কখন, আলেক্‌জাণ্ডার ?"

কুড়িটাকা মাহিনার সোলাপুরি-চেকের-সুটপরা, কৃষ্ণকায় প্রৌঢ় কম্পাউণ্ডারটিই এ বিরাট্ নামে অভিহিত।

আলেকজাণ্ডার বলিল, "বেলা একটায়।"

মোহান অবাক্ হইয়া বলিল, "এখনও রক্ত পাওয়া যায় নি ?

আলেকজাণ্ডার বলিল, "রোগিণীর সঙ্গেই লোক ছিল, কিন্তু, তার সঙ্গে রক্ত মেলে নি।"

মোহান জিজ্ঞাসা করিল, "কি রোগ তার ?'

আলেকজাণ্ডার বলিল, "টি বি অব দি ইন্‌টেষ্টিন্‌স্ (অন্ত্রের ক্ষয়)। পুরাণো রোগ। এ শেষ ষ্টেজ। এনিমিয়া দেখা দিয়েচে! শরীরে অপারেশন করবার মত রক্ত নেই। অন্যের রক্ত ছাড়া নিরুপায়।"

মোহান বলিল, "আমি রক্ত দেব। চল, পরীক্ষা করাবে।"

এই কয়মিনিট আগে মোহান দেহ-পুষ্টির জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিল, এরি মধ্যে দেহক্ষয় করিতে প্রস্তুত হইয়া গেল! তবে কি তাহার কঠোর সংকল্পের প্রভাবে গ্ল্যাণ্ডগুলি আভ্যন্তরীণ রসনিঃসারণ আরম্ভ করিয়া পৌরুষভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে ? তাহা হইলে গ্ল্যাণ্ড শুধু মনকে চালায় তাহা নয়, মনও গ্ল্যাণ্ডকে চালাইতে পারে ?

মোহান ক্লিনিকে চলিল, আলেকজাণ্ডার "কেস" আনিতে গেল। ধোবী যেমন ভাবে কাপড়ের দিকে চায়, মুচি যেমন ভাবে জুতার দিকে চায়, ছুতার যেমন ভাবে কাঠের দিকে চায়, এ প্রবীণ কম্পাউণ্ডার তেমনই করিয়া রোগীর দিকে চায়! তাহারা তাহার কাছে শুধু "কেস,"— কোনোটা জীবনীশক্তিপূর্ণ, কোনোটা মরণের প্রথম ধাপে, কোনোটা দ্বিতীয় ধাপে, কোনোটা বা তার চেয়ে আরও বেশী অগ্রসর। সে তাহাদিগকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া, মলম লাগাইয়া, পোলটিস্ দিয়াই ক্ষান্ত হয়, তার অধিক কিছু ভাবে না।

ক্লিনিকের দরজা খুলিয়া যখন আলেকজাণ্ডার ঢুকিল ও তাহার পশ্চাতে শ্বেতবসনা তাহার "কেস" আসিল, তখন ঘরের এক কোণ হইতে মোহান সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে এতক্ষণ দীপশিখার উপর

কাচের 'স্লাইডে' যক্ষ্মার শ্লেষ্মা ষ্টেইন করা লক্ষ্য করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সমস্ত ভুলিয়া নিবিষ্ট দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল, সেই 'কেস'টির দিকে। এ ত তাহার কাছে শুধু 'কেস' নয়, তাহা যদি হইত, তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ দ্রুত হইয়া উঠিবে কেন, তাহার স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর এত টানা-হেঁচড়া চলিবে কেন ?

মোহান দেখিল, একটি সুন্দর তরুণ দেহ ফুলের মত মিয়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিল, শীর্ণ শুভ্র মুখখানি। ঈষৎ ভাঙ্গাপড়া কপালটি। অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল দুটি চোখ গভীর কোটরের ভিতর হইতে ভীরু কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। গাল শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তার উপর কেমন একটা অলৌকিক চাকচিক্য, কেমন একটা অবাস্তব লাবণ্য ! নাকের ডগাটি অসম্ভব রকম তীক্ষ্ণ ! ঠোঁটের রেখাগুলি কালো হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে রেখার স্পষ্টতা ঠোঁট দুটিকে চিত্রের মত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে !

জীবনান্তের এ অপরূপ রূপচ্ছটা মোহানের হৃদয় মুগ্ধ করিল।

ল্যাবরেটরী এসিষ্ট্যাণ্ট মোহানের আঙ্গুলে সূচ ফুটাইয়া একটু রক্ত লইল। রোগিণীর আঙ্গুলে সূচ ফুটাইতে গেলে সে ভীত হইল। এসিষ্ট্যাণ্ট বলিল, "ভয় নেই, কিছু হ'বে না।"

আলেকজাণ্ডার বলিল, "ও কিছু নয়, শুধু এক ফোঁটা রক্ত নেবে !" কিন্তু রোগিণী তাহার ঈষৎ কম্পিত হাতখানি তুলিয়াও তুলিল না। মোহান অগ্রসর হইয়া নিজের হাতখানা দেখাইয়া, বাংলা, হিন্দি ও মারাঠী মিশাইয়া বলিল, সেও রক্ত দিয়াছে, তাহার কোনও কিছু হয় নাই। তখন রোগিণী ঈষৎ হাসিয়া, হাতখানি বাড়াইয়া পরিষ্কার ইংরাজীতে আস্তে আস্তে বলিল, "আচ্ছা বেশ, তবে দেখবেন ব্যথা যেন না দেওয়া হয়।"

সে হাসিটি আবার বেচারী মোহানের স্নায়ুমণ্ডলীকে আর একটা মোচড় দিয়া গেল। বুকের ভিতরে সব রক্তগুলি আলোড়ন করিয়া উঠিল।

এসিষ্ট্যাণ্ট রোগিণীর রক্ত লইল, এবং দুই রক্ত মিলাইয়া দেখিতে টেবিলের দিকে গেল।

মোহান রোগিণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আশা করি আমার রক্ত আপনার কাজে লাগ্‌বে।"

মেয়েটি মাথা নোয়াইয়া, একটি পা একটু বাড়াইয়া, সলজ্জ-ভাবে বলিল, "আপনি আমার জন্য কত কষ্ট কর্‌তে প্রস্তুত হয়েচেন!"

উত্তরে মোহান আশ্বাস দিয়া বলিল, "এ আবার কষ্ট! এ কিছুই নয়। কত সময় আঙুল কেটে কত রক্ত পড়ে যায়! রক্ত আর কত নেবে—২০০ c. c, ? ৩০০ c. c.? ৪০০ c. c.? এতে আর কি এসে যাবে?"

মোহানের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে মেয়েটি তাহার কোমল চোখ দুটি তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। এ অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল।

এ দৃষ্টিতে মোহানের প্রাণের উৎসাহ দশগুণ বাড়িয়া উঠিল! তাহার অন্তর বলিতে চাহিতেছিল, "৪০০ c. c. রক্ত কেন, আমার দেহের সবখানি রক্ত নিঃশেষে দিয়েও যদি তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো!" কিন্তু মুখে তাহা বলিতে পারিল না। শুধু তাহার নীরব মমতাভরা দৃষ্টিটুকু সে বার্ত্তা বহন করিতে চাহিল।

দীর্ঘকালের রোগিণী। দৈনন্দিন শত তিক্ততায় তাহার প্রাণ জর্জ্জরিত। তারপর আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় হৃদয় অবসন্ন। এ

অবস্থায় ঐ তরুণ যুবকের উজ্জ্বল প্রশংসমান দৃষ্টির সাম্‌নে তাহার ফ্যাকাশে মুখখানি সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল।

মোহান ভাবিল, রক্তপরীক্ষা গিয়া দেখিবে। কিন্তু কেমন যেন একটা চুম্বকের মত আকর্ষণে তাহার চক্ষু দুটি ফিরিয়া আবার সে তরুণীর ব্যথা-স্নিগ্ধ মুখখানির উপর ন্যস্ত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পড়তেন বুঝি ?"

তরুণী বলিল, "না, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতাম্।"

মোহান প্রশ্ন করিল, "আপনার ব্যারাম কবে থেকে ?"

তরুণী বলিল, "ইস্কুলে কাজ নেবার কিছুকাল পরেই হয়, তবে প্রথম অবস্থায় বুঝতে পারি নি।"

মোহান বলিল, "অতিরিক্ত খাটুনি, আহারের অপূর্ণতা, পর্য্যাপ্ত আলো-হাওয়ার অভাব এ সবই এ রোগের কারণ।" এমন সুন্দর তরুণী মেয়েটি দুর্ব্বহ কর্ম্মভারে পীড়িত, একথা ভাবিতেই মোহানের হৃদয় করুণায় দ্রব হইয়া উঠিল।

তখন এসিষ্টাণ্ট সহাস্য মুখে আসিয়া বলিল, "রক্তের মিল হয়েচে!"

একটা অদম্য উল্লাসে মোহানের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে উচ্চৈঃ-স্বরে বলিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !" তরুণীর দিকে চাহিয়া বাঙ্গলার সহজ ভাবপ্রবণতার বশে বলিল, "তা' হ'লে হয়ত ভগবানের ইচ্ছায় আপনার জীবন রক্ষা হ'বে !"

মেয়েটির মুখমণ্ডলে যা-কিছু রক্ত ছিল, তার প্রায় সবই আসিয়া তাহার গাল দুটিতে জড় হইল। সে মূকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। উচ্ছ্বাসের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ যেন বরফের মত কঠিন হইয়া পড়িল। আর্য্যাবর্ত্তে আর দাক্ষিণাত্যে এই প্রভেদ !

কম্পাউণ্ডার আলেকজাণ্ডার বলিল, "এখন ডাক্তারের কাছে যেতে হ'বে। তিনিই রক্ত নেবেন।"

মোহান এসিষ্ট্যাণ্টের হাত হইতে রক্তপরীক্ষার ফর্ম্মখানা লইয়া কম্পাউণ্ডারের হাতে দিল। দিবার পূর্ব্বে রোগিণীর নাম পড়িল—"মিস্ চম্পা ঘোরগেরীকর।"

আলেকজাণ্ডার তাহার কেস্ লইয়া চলিয়া গেল। মোহান বাহিরে আসিতে আসিতে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, "চম্পা ঘোর-গেরীকর।" চম্পা নামটি বেশ মিষ্টি লাগিল তাহার কাছে। কিন্তু "ঘোরগেরীকর" নামে সে রুষ্ট হইয়া উঠিল। ঐ কোমলা, ক্ষীণা, তন্বী মেয়েটির নাম, "ঘোরগেরীকর ?" তাহার কাছে ইহা একটা উৎকট বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এই শ্রুতিকঠোর শব্দটি ভুলিয়া গেল, তাহার মনে ঘর্ঘর জাতীয় একটা অস্পষ্ট ঝঙ্কার মাত্র রহিল! তবে মেয়েটির ব্যক্তিগত নামটি তাহার মনে গাঁথা হইয়া রহিল—চম্পা! চাঁপার কলি!...

৩

সেদিন বেলা সাড়ে বারোটায় হস্পিট্যালের ২৭ নম্বর ঘরে ২১৩ নম্বরের '.কস' টি অপারেশনের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। তাহার সঙ্গের লোক মধ্যাহ্ন আহারে গিয়াছে, তাই সে একা।

তখন একটি তরুণ যুবক সজোর, সোল্লাস পাদক্ষেপে তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মোহান হাসিমুখে বলিল, "কেমন আছেন আপনি? ইতিমধ্যে আমি স্কুলে গিয়ে একটা লেকচার শুনে এলাম। একটু ভাল বোধ হচ্ছে, না, মিস্ চম্পা?"

মোহনেরই দেওয়া রক্তে চম্পার গালদুটি অপ্রত্যাশিত ভাবে লাল

হইয়া উঠিল। সে একটু আবেগভরে বলিল, "এমন ভাল বহুদিন থাকিনি।" মিষ্টবাক্যে তাহাকে ধন্যবাদ জানাইল।

মোহান ঘরে গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। রোগিণীর সঙ্গীর খোঁজ লইল। অপারেশন বিষয়ে তাহাকে নির্ভয় হইতে বলিল। অপারেশনের উল্লেখে চম্পার মুখ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল।

মোহান বলিল, "আপনি ভুল করেছেন। অনেকদিন আগেই অপারেশন করানো উচিত ছিল।"

চম্পা বিষাদমাখা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা' বুঝি। তবে হয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে, আপনার সাহায্য নিতে হ'বে, তাই দেরী হ'ল।"

এ কথায় মোহান অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। রং আরও ফর্সা হইলে তাহার গালও রাঙিয়া উঠিত।

কিছুক্ষণ পরে মোহান বলিল, "আপনি তৈরি হোন, আপনাকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অপারেশন-থিয়েটারে যেতে হ'বে।"

চম্পার মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, আমি তো তৈরিই!" তারপর চুপ করিয়া রহিল। একটা কি ভাবনা যেন তাহার মন চাপিয়া বসিয়াছিল। সে শুধু টাইল ঢাকা মেজটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মোহান বলিল, "আপনি কি ভাবচেন"?

চম্পা চোখ তুলিয়া, একটু চকিতভাবে বলিল, "ভাবচি, আপনার সঙ্গে এই শেষ দেখা।" তাহার কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত হইল। এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া শীর্ণ গালটির উপর পড়িল।

মোহান বলিল "দূর্। আপনি ভারি ভীরু। আমি বল্‌চি, বিশ্বাস করুন, আপনি একেবারে সেরে যাবেন। আমার রক্তগুলো কখনো বৃথা যাবে না।"

চম্পা মোহানের মুখের দিকে এক মুহূর্ত নিবিষ্টভাবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা মিষ্টার—" বলিয়া মোহনের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নাম তো আমি জানি নে।"

মোহান আগ্রহের সহিত বলিল, "আমার নাম মোহান, স্যামুয়েল মোহান"।

চম্পা তাহার দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনি ক্রিশ্চ্যান্"।

মোহান বলিল, "হ্যাঁ।" বলিয়া যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বলিল, "আমি বাঙ্গালী। আমাদের দেশে হিন্দুতে ক্রিশ্চানে ভেদভাব নেই। আমার অধিকাংশ বন্ধুই হিন্দু।"

চম্পা একটু হাসিয়া বলিল, "আমিও ক্রিশ্চ্যান্।"

পুরুষ যখন ক্রিশ্চ্যান হয়, তখন তাহার নাম হয়, মাইকেল, স্যামুয়েল, জোসেফ ইত্যাদি। কিন্তু মেয়ে ক্রিশ্চ্যানদের নাম, চম্পা, বিমলা, তরুলতা, এসবই থাকে। যেমন পুরুষ ক্রিশ্চ্যান্ হ্যাট্‌কোট পরিয়া সাহেব সাজে, কিন্তু মেয়ে ক্রিশ্চ্যান্ শাড়ীই পরে। তাই চম্পার নামের মধ্যে মোহান তাহার ধর্ম্মের পরিচয় পায় নাই।

মোহান চমকিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আপনি ক্রিশ্চ্যান্? আপনাদের কোন্ চার্চ্চ?"

চম্পা ধীরে ধীরে বলিল, "এ্যামেরিক্যান্ প্রেজবিট্যারিয়ান্। আপনাদের?" বলিয়া উৎসুকভাবে মোহনের দিকে চাহিল।

মোহান বলিল, "স্কটিস্ প্রেজবিট্যারিয়ান্।"

দুজনে চোখে চোখ মিলাইল। সে দৃষ্টি-বিনিময়ে একটা নূতন আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিল।

একটু থামিয়া চম্পা সলজ্জভাবে বলিল, "আচ্ছা, মিষ্টার মোহান,

আপনি যে আপনারি নিজ শরীর থেকে ঐ রক্তগুলি দিয়েছেন, তা' আমি বলে' দিয়েছেন, না যাকে-তাকেই দিতেন ?"

প্রশ্নটা যে এত জটিল হইবে, মোহান কল্পনা করে নাই। ক্ষণকাল সে শুধু অবাক হইয়া চম্পার লজ্জা-বিধুর দৃষ্টিটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তারপর উৎসাহভরে বলিল, "হয়ত অন্যকেও দিতাম, তবে আপনাকে যেমন অন্তরের সহিত দিয়েছি, অন্যকে ককৃখনো তেমন দিতাম না।"

চম্পার দৃষ্টিটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি ভাল হ'য়ে উঠি, তবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হ'বে ?"

মোহান জোর গলায় বলিল, "তা' আর বল্‌তে আছে ? আপনাদের বাড়ী কোথায় ?"

চম্পা বলিল, "আহ্‌মদনগরে।"

মোহান বলিল, "তা' বেশ। ঠিকানাটা রেখে যাবেন, আমি প্রত্যেক ছুটির সময় দেশে আস্‌তে যেতে আপনাদের ওখানে হয়ে আস্‌ব।"

চম্পার মন যেন পূর্ব্ব চিন্তাতেই মগ্ন ছিল। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই, তবে আমাকে আপনার মনে থাক্‌বে ?" বলিয়া দুর্ব্বল চক্ষুদুটি তুলিয়া চাহিল।

মোহান বলিল, "এ কথার আমি উত্তর দেব না। কেননা, আমরা যে আপনাকে মরতেই দেব না।"

চম্পা মৃদু হাসিল। গভীর বেদনামাখা সে হাসিটি। তার ভিতরে যেন একটা বুক-ভাঙ্গা কাঁদন লুকানো ছিল। চম্পা বলিল, "আমি তো মরলামই, শেষ সময়ে আপনাকে কষ্ট দিয়ে গেলাম। আপনার ঋণ—"

মোহান বাধা দিয়া বলিল, "সে সব কথা বলবেন না, মিস্ চম্পা, তা' বল্‌লে আমি রাগ করবো!"

সে-কথার সুরে নারীরই মত অভিমান মাখা ছিল! চম্পা কতকটা বিস্মিত হইল। বাঙ্গালীর হৃদয়ের সঙ্গে জীবনে তাহার এই প্রথম পরিচয়!

উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। মোহানের মুখখানি অত্যন্ত ক্লিষ্টভাব ধারণ করিল।

সে নীরবতা ভঙ্গ হইল নার্সের আগমনে। ২৭ নম্বর ঘরে তখন তাহার 'ডিউটি' ছিল। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রকে রোগিণীর পাশে ও-রকম মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তরুণী নার্স খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার মাথায় শাদা "হুড্," ঘোমটার মত ঢাকিয়া আছে, গায়ে শাদা এপ্রনের আবরণ। তাহার রংটি মিশ্‌মিশে কালো, ভারী ঠোঁট, মোটা নাক, পুরু গাল। বয়স কম হইলেও বেশ লম্বা, চৌড়া, জবরদস্ত চেহারা। জাতিতে আদি-দ্রাবিড়, হিন্দু সমাজের আইন-মতে অতিশূদ্র, অস্পৃশ্য। বোধ হয় সমাজের এবং গ্রামের বাহিরে থাকে বলিয়া ইহাদের জীবন সহজ, সক্রিয়, স্বাস্থ্যপূর্ণ। সে ক্রিশ্চ্যান হইবার পূর্ব্বে সাতারা জেলার এক সবুজ অধিত্যকার উপর মোষ চরাইত—এবং মাঝে মাঝে চড়িতও! ক্রিশ্চ্যান হইয়া সভ্য-ভব্য হইয়াছে। তবে বংশানুক্রমিক দুরন্ত জীবনী-শক্তির বশে এক এক সময়ে হঠাৎ তাহার ঠোঁট দুটি খুলিয়া যায়, শাদা দাঁতের পাটি ঝল্‌মল্ করিয়া উঠে, গাল ভাঙ্গিয়া পড়ে, তরুণী কারণে অকারণে হাসিয়া কুটি-কুটি হয়। সেই মুক্ত প্রাণখোলা হাসি যাহা তাহার স্ববংশীয়েরা এখনও মাঠময় ছড়াইয়া দেয়। প্রবীণা এ্যামরিক্যান্ ম্যাট্রনের ভ্রুকুটি এতদিনের মধ্যেও সে হাসিকে দমন করিতে পারে নাই।

নার্সকে দেখিয়া মোহান কেমন মুখ কাচুমাচু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া তাহার অবরুদ্ধ হাসি তুবড়ী বাজির মত ছুটিয়া বাহির হইল। সে কাপড় দিয়া মুখ যতই চাপে, হাসি ততই উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

অনেক চেষ্টায় নার্স আত্মসংযম করিয়া বলিল, তাহাকে সে ঘরের বিছানা তৈরি করিতে হইবে, অপারেশনের পর রোগিণীকে রাখিবার জন্য।

রোগিণী বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। মোহান বলিল, "আপনাকে বাইরে যেতে হ'বে না, এই চেয়ারটাতে বসুন্।" বলিয়া চেয়ারখানা আগাইয়া দিল। নার্স বিছানার পুরাণো চাদর ফেলিয়া নূতন চাদর পাতিতে পাতিতে দুই হাতে চাদরের কোণ দিয়া সজোরে মুখ চাপিয়া রাখিতেছিল,—শুধু তাহার শ্বাসরোধক্লিষ্ট ডাগর কালো চোখ দুটি ভিতরের অদম্য হাসির সন্ধান দিতেছিল।

নার্সের ভাব দেখিয়া মোহান তো চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা। বিশেষ রকম কঠোরভাবে তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চম্পার অভিভাবক দাদা হোটেল হইতে মধ্যাহ্নের আহার সারিয়া ফিরিয়া আসিল। মোহানকে দেখিয়া অনেক রকম সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিল। মোহান অপরাধী বালকের মত প্রত্যেক কথাতেই মাথা নাড়িয়া চলিল। অবশেষে চম্পার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কম্পাউণ্ডার আস্‌চে, আপনাকে এখন অপারেশনের জন্য যেতে হ'বে, আমি এবার পালাই।" রোগিণীর গভীর অক্ষিকোটর হইতে দুইটি ক্ষীণ চক্ষু অতৃপ্তভাবে যুবকের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৪

অপারেশন ঘর। বড় একটি হল, দুই দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত

কাচের বেড়া ; দেয়াল, মেঝে সাদা ঝক্‌ঝকে টাইল দিয়া মোড়ানো। উজ্জ্বল আলোতে সারা ঘরখানা ধব্ ধব্ করিতেছে।

তখন বেলা একটা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, চারিদিকে লোকে ঘেরা। অদ্ভুত পোযাক তাহাদের,—মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। এক দিকে একটি লোক একটা শিশি হাতে দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা ক্লোরোফর্ম্ম টেবিলে শায়িত দেহটির নাসারন্ধ্রের উপরে একটি ছোট জালিতে পড়িতেছে। অপর সকলেই দেহটিকে ধরিয়া রহিয়াছে। শুধু একজন—সার্জ্জন—অস্ত্রোপ-চারে ব্যস্ত।

দেহখানি সাদা কাপড়ে জড়ানো শুধু মুখ আর বুকের নীচ হইতে কোমর পর্য্যন্ত খোলা। কোমরের কাছে একটা ভাগ কাটিয়া ভিতরের অন্ত্র উন্মোচিত করা হইয়াছে। ডাক্তার গভীর অভিনিবেশের সহিত সে অন্ত্রের এক অংশ পৃথক্ করিল। তার পর অপর দুইভাগ সেলাই করিতে লাগিল।

সেই দ্বিখণ্ডিত অন্ত্রটি ছাড়া যে জগতে কিছু আছে, ডাক্তারের চিত্ত এখন তাহা জানে না।

ডাক্তার সকালে সাতটায় চা খাইতে খাইতে বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করিয়াছে, বেলা দশটায় পত্নীর সঙ্গে খানা খাইবার সময় দেশের চিঠির বিষয় আলেচনা করিয়াছে, অপারেশনের পর বেলা দুইটায় ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা করিবে, বেলা ছয়টায় টেনিস খেলিবে, সন্ধ্যা নয়টায় পিয়ানো বাজাইবে,—কিন্তু এখন ঐ দুইটা নাড়ী জোড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর তাহার জন্মভূমি নিউইয়র্ক ষ্টেট হইতে আরম্ভ করিয়া এই বম্বে প্রেসিডেন্সি পর্য্যন্ত কত নগর, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, বন্দর, জাহাজ, রেলের ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু

এই মুহূর্ত্তে, অন্ত্রের ভিতর সূচী প্রয়োগের জ্ঞান ছাড়া আর কোনও স্মৃতিই তাহাতে নাই। রাগিণীর চারিদিকের সকলের চক্ষু সেই ছিন্ন অন্ত্রটির উপরই নিবদ্ধ হইয়া রহিয়া রহিয়াছে।

সহসা একজনের হাত বহু অভ্যাস সত্ত্বেও কাঁপিয়া উঠিল,—সে নাড়ী ধরিয়াছিল। আড়ষ্ট কণ্ঠে সে ডাক্তারকে বলিল, "নাড়ী বড় দুর্ব্বল।"

বিদ্যুতাহতের মত অস্ত্র ফেলিয়া ডাক্তার নাড়ীধরিল। ক্ষনেকের জন্য তাহার রৌদ্র-দগ্ধ সাদা মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

ডাক্তার পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া, দৃঢ় কণ্ঠে একটা ঔষধের নাম করিল। পাশ হইতে নার্স সে ঔষধ তুলিয়া ধরিল। তাহা রোগিনীর নাকে প্রয়োগ করা হইল।

ডাক্তার আবার নাড়ী ধরিল। তাহার মুখ শান্তভাব ধারণ করিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "রক্ত যে দিয়েছিল, সে কোথায় ?" বলিয়া দরজায় দণ্ডায়মান রোগিণীর অভিভাবকের দিকে চাহিল।

আলেকজাণ্ডার রোগিণীর এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "মোহান।"

ডাক্তার বলিল, "তাকে শিগ্‌গির ডাক, আরও রক্ত চাই।"

আলেকজাণ্ডার নিমেষের মধ্যে ছুটিয়া গেল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিল। সামনে দুইজন চাকর পাইয়া একজনকে ছাত্রাবাসে ও অপরকে স্কুলের দিকে পাঠাইল।

অপারেশন ঘরে ডাক্তার তাহার শক্তিতে যতদূর কুলায়, দ্রুতভাবে ছিন্ন অন্ত্র সেলাই করিতেছিল। হয় ত পাঁচ মিনিট, এমন কি দুই মিনিট দেরী হইলে রোগিণীর জীবন শেষ হইয়া যাইতে পারে। তখনকার একএকটি সেকেণ্ড অতি মূল্যবান।

"মোহান !"

সকলের চকিত দৃষ্টি দ্বারের দিকে ফিরিল। ডাক্তার বলিল, "মোহান, রক্ত রোগীর পক্ষে প্রচুর হয় নি। তুমি আরও দিতে প্রস্তুত আছ ?" ডাক্তারের দ্রুত আমেরিকান উচ্চারণের মধ্যে মোহান অতি কষ্টে কথাগুলি উদ্ধার করিল।

ডাক্তার দৃঢ়দৃষ্টিতে মোহানের দিকে চাহিল। তার অর্থ, সত্বর উত্তর চাই। একটি সেকেণ্ডও অপচয় করা যায় না। মোহান উত্তর দেয় না কেন ?

সে রক্ত দেওয়া না দেওয়ার কথা ভাবিতেছিল না, শুধু অবাক্ হইয়া চাহিয়াছিল চম্পার এলায়িত দেহখানির প্রতি। দেখিতেছিল, সেই অস্ত্রবিদ্ধ স্থান, তার ভিতরের অন্ত্রসমষ্টি, বাহিরের 'ক্লিপ'-কুঞ্চিত দেহভাগ, —আর পাণ্ডুর, মড়ার মত মুখ—

একটি মুহূর্ত্তের তরে মোহানের চক্ষুদুটি অলসভাবে সে দৃশ্যটির মধ্যে ডুবিয়া রহিল,—একটি মুহূর্ত্তের তরে সে নির্ব্বাক্ নিষ্ক্রিয় হইয়া শুধু দেখিতেই লাগিল।

ডাক্তার বলিল, "তবে ?"

সঙ্কল্পের দারুণ কশাঘাতে মোহানের চক্ষু দুটি ফিরিয়া ডাক্তারের কঠোর দৃষ্টির সম্মুখীন হইল।

মোহান বলিল, "আমি প্রস্তুত।"

মোহানের রক্ত টিউবে লইয়া যখন ডাক্তার চম্পার দেহে সঞ্চারিত করিতে লাগিল, তখন তাহার চিত্ত পুলকে শিহরিয়া উঠিল। মোহানের মনে হইল সে যেন তাহার বক্ষের তাপ দিয়া চম্পার শীতল দেহখানিকে উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে।

মনে হইল, যেন সে-মুহূর্ত্তের তরে চম্পা তাহার,—একান্ত ভাবে তাহারই।

ডাক্তার বলিল, "ধন্যবাদ।" বলিয়া আবার ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রচালনা আরম্ভ করিল। এবার অন্ত্রের অপর দিকে আর একটা ঘা আবিষ্কার করিয়া তাহাতে অস্ত্র চালাইল। রোগিণীর এক একটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-মরণের সম্ভাবনা জড়িত। তাই ডাক্তারের আঙ্গুল যুগপৎ দৃঢ় ও চঞ্চল। তাহা যদি একটিবার একটু শ্লথ হইয়া পড়ে, একটিবার যদি তাহার হাত কাঁপে, একটিবার যদি হৃদয় উতলা হইয়া উঠে, স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া যায়, তবে রোগিণীর প্রাণসংশয়। এই কয়েকটি মিনিটের তরে আজ তাহার সমস্ত পৌরুষ, সমস্ত মনুষ্যত্ব ঐ যন্ত্রটির আগায় কেন্দ্রীভূত।

ডাক্তারের প্রতি অঙ্গুলি চালনার সঙ্গে সঙ্গে মোহানের বক্ষোরক্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। ডাক্তারের একএকবার হাত ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ ডাক্তার রোগিণীর হাত ধরিল কেন? তবে কি নাড়ী চলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে? ডাক্তার কি হঠাৎ অস্ত্র ফেলিয়া বলিবে,— 'Next case!' 'পরের রোগী আন'!

ডাক্তার আবার অস্ত্র হাতে লইয়াছে। আবার সে নাড়ী সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক একটা সেলাইএর টান যেন মোহানের হৃদয়ের তন্তুগুলিকে ছিন্ন করিয়া লইতেছে।

প্রতিটি সেকেণ্ড এখন তাহার কাছে একটি মর্ম্মন্তুদ বেদনা হইয়া দাঁড়াইল। মোহান ডাক্তারের স্থির কঠিন মুখের দিকে চাহিয়া নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইল; ভাবিল, সে কোনও দিন সার্জ্জন হইতে

পারিবে না, শুধু ঔষধ প্রেস্‌ক্রিপশন করিয়াই তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে।

মোহানের দেহে রোমাঞ্চ বহাইয়া ডাক্তার অস্ত্রশুদ্ধ হাত তুলিল, অস্পষ্ট ভাবে বলিল, 'ঘরে নিয়ে যাও, মাথায় খুব বরফ দাও। দরকার হ'লে একটা ইনজেকশন দিতে হ'বে।'

মোহানের স্নায়ুপুঞ্জ জ্যামুক্ত ধনুকের মত ছাড়া পাইল। তবে চম্পা জীবিত! তাহার শিরায় শিরায় রক্তের স্রোত উল্লাসে নৃত্য করিয়া ছুটিল।

মোহানের চক্ষে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। হয়ত চম্পা আরোগ্য লাভ করিবে। হয়ত এ কঠোর ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইবে! হয়ত একদিন সুস্থ দেহে আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইবে। তখন রোগের কথা ভুলিয়া যাইবে, তাহার কোটরগত চোখ দুটি ডাগর হইয়া, উজ্জ্বল হইয়া তাহার দিকে চাহিবে!

"ষ্ট্রেচারে" করিয়া চারিজন বাহক চম্পাকে উপর তলা হইতে নীচে নামাইয়া আনিল, এবং ২৭ নং ঘরের দিকে চলিল। মোহান পাশে থাকিয়া শুধু বলিতে লাগিল, "আস্তে! আস্তে!" সেই স্পন্দহীন জড়বৎ দেহখানির দিকে এক একবার চাহিয়া মোহানের চিত্ত শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

৬

রাত্রি আটটা। মোহান বিকালের চা খায় নাই, সন্ধ্যায় ডিনার খায় নাই, রোগিণীর মাথার পাশে বসিয়া ছিল। তাহার মুখখানা ভার, চোখ ছল্‌-ছল্‌। চম্পার দাদা বরফ আনিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। নার্স "আইস-ব্যাগে" বরফ লইয়া রোগিণীর মাথায় লাগাইয়া রাখিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিল, মোহান তৎক্ষণাৎ গিয়া নিজ হাতে তাহা লইয়া মাথায়

তুলিয়া ধরিল। তাহা দেখিয়া যে নার্সের চোখদুটি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার শাদা দাঁতগুলির উপর কাপড় চাপা দিতে হইয়াছিল,—মোহানের তাহা লক্ষ্য করিবার সময় হয় নাই।

রোগিণীর অভিভাবক শয্যার পাশে বসিয়া রহিল। মোহান 'আইস-ব্যাগ' প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে কয়েক মিনিটের জন্য "ডিউটির" খাতিরে কয়েকটা রোগীকে একবার দেখিতে গেল। আজ "ডিউটি" করিতে তাহার মন সরিতেছিল না। ভাবিতেছিল, কি কাজ ওসব দুনিয়ার হতচ্ছাড়া লোকদের পরিচর্য্যা করিয়া? তাহার অধীনস্থ প্রথম রোগী—কৃষ্ণকায়, দাড়িওয়ালা, রক্তচক্ষু, মধ্যবয়স্ক একটি লোক,—তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'দুর্ব্বৃত্ত সারাজীবন সমাজের নর্দ্দমায় প'ড়ে থেকে, পচে-গ'লে, দারুণ ব্যাধি নিয়ে এসেচে, তার জীবন রক্ষার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হ'বে! কেন? তা'কে দিয়ে জগতের কি উপকার হ'বে? তা'কে অপারেশন কর, ইন্‌জেকৃশন দাও, ধোয়াও, ঔষধ দাও, তারপর কতক ভাল হ'য়ে সমাজে ফিরে গিয়ে, আবার দুচার বছর পরে রোগকে আরও কঠিন, আরও সংক্রামক করে' নিয়ে ফিরে আস্‌বে!' সেই দাড়িওয়ালা মোহানকে দেখিয়া কাত্‌রাইতে লাগিল। মোহান তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অপর রোগীদের কাছে গেল। তাহাদেরে চোখের দেখা দিয়া ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল, "Clay souls! কাদায়-গড়া অন্তর এদের—এদের জন্য কেন আমরা ভেবে মরবো?" এক ঘরে দেখিল, দুইজন মিশনারি মেয়েমানুষ রোগীদেরে খৃষ্টবিষয়ক ধর্ম্মসঙ্গীত শুনাইতেছে। মোহান মনে মনে হাসিল, ভাবিল, "এ বিপদের সাহায্যে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্মভাব ঢোকানো, সে ভাবের স্থায়িত্ব বা মর্য্যাদা কতটুকু?"

মোহান চম্পার ঘরে ফিরিয়া আসিল। চম্পার অজ্ঞান দেহটির পাশে দুইটি লোক নীরবে বসিয়া রহিল।

সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে একটা অর্দ্ধস্ফুট বেদনার কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহা একবার ডুবিয়া যায় আবার উঁচু হইয়া উঠে। হঠাৎ নিকটবর্ত্তী ওয়ার্ড হইতে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ ছুরির মত তাহাদের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। চম্পার দাদা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ?"

মোহান বলিল, "ও কিছু নয়, হয়ত পুরানো ব্যাণ্ডিজ খুলিয়া নূতন ব্যাণ্ডিজ দেওয়া হচ্ছে, হয়ত বা ইন্‌জেক্‌সন দিয়েচে। ওরকম করে' কাঁদা একটা অভ্যাস, 'নার্ভ' ও 'মাসেলের' প্রতিক্রিয়া। যে যেভাবে ব্যথা প্রকাশে ছেলেবেলা হ'তে অভ্যস্ত হয়েচে, সে সেইভাবেই প্রকাশ করবে।"

মোহান কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া খুসী হইল। বলিতে লাগিল, "দেখুন, সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হ'লে এদেশী লস্করেরা ডাক-হাঁক হৈ-চৈ করে, কিন্তু ইউরোপীয় নাবিকেরা নীরবে কাজ করে' যায় ; এর মানে এই নয় যে, এ দেশীয়েরা ভীরু ; এ শুধু একটা অভ্যাসের বিষয়।"

চম্পার দাদা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

আবার নারীকণ্ঠের করুণ চীৎকার উঠিল। যেন কার হৃৎপিণ্ডে সূচ ফুটাইয়া দেওয়া হইতেছে, যেন কার মজ্জার ভিতর বিদ্যুৎ চালনা করা হইতেছে।···

মোহান আবার উঠিয়া ডিউটিতে গেল। দেখিল, একটি মেয়ের ভাঙা কনুইয়ের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া বাঁধা হইতেছে, আর সে নিদারুণ ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। দেখিল, দাড়িওয়ালা কালো লোকটি দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে, দেহের নিম্নার্দ্ধ তীব্র বেদনায়

বাঁকিয়া পড়িয়াছে। দেখিল, এপেঁণ্ডিক্স্ অপারেশন করা একজন ইউরোপীয়ান রোগিণী বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

মোহান দ্রুতবেগে ২৭ নম্বর ঘরে ফিরিল। তখন রোগিণীর শ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞানহীন দেহ হইতে ধীরে ধীরে ক্লোরোফর্ম্মের নেশা কাটিয়া যাইতেছে। উভয়ে চকিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে চম্পা মাথা ফিরাইল। অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আয়ী গ!" মোহান মারাঠী না জানিলেও একথাটির সহিত খুব পরিচিত। "আয়ী গ!"—মা গো!—এ ভারতের ব্যথার ভাষা! পরমেশ্বরকে প্রার্থনা নয়, সাধুসন্তের আশ্রয় ভিক্ষা নয়, দারুণ ব্যথায় জননীকে আহ্বান!

চম্পা চোখ মেলিল। মোহান সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি কেমন আছেন?"

চম্পা বলিল, "মিষ্টার মোহান? আমি কোথায়? ঘর আঁধার কেন?"

মোহান আলো জ্বালাইল। রোগিণীর দেহে চাঞ্চল্য দেখা দিল, বমন আরম্ভ হইল। মোহান চম্পার দাদাকে বুঝাইতে লাগিল, এ ক্লোরোফর্ম্মের প্রতিক্রিয়া, ভয়ের কোন কারণ নাই।

তারপর চম্পা খুব কথা বলিতে লাগিল। মোহান বলিল, এও ক্লোরোফর্ম্মেরই ক্রিয়া।

চম্পা বলিল, "আমার অপারেশন হয়েছে?"

মোহান বলিল, "হ্যাঁ, খুব সুন্দররূপে হয়েছে, কোনও ভয় নেই।"

চম্পা চঞ্চলভাবে বলিতে লাগিল, "মিঃ মোহান! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার হৃদয় অতি মহৎ।"

তারপর তাহার দাদাকে মারাঠীতে দ্রুতভাবে আরও কত কি বলিল।

মোহান আইস্ ব্যাগে আবার বরফ ভরিয়া দৃঢ়ভাবে রোগিণীর মাথায় চাপিয়া ধরিল। দেখিল চম্পার শুভ্র কপালটির উপর চূর্ণ-কুন্তল ছড়াইয়া পড়িয়াছে।......'চূর্ণ-কুন্তল'! কথাটা মোহান একটি বাংলা উপন্যাসে পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চম্পা আবার বলিতে লাগিল, "মিষ্টার মোহান, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ী আসবেন, নিশ্চয়ই! দাদা, তাঁকে তুমি বিশেষ করে অনুরোধ করো।"

নার্স আসিয়া তাপ লইয়া দেখিল, রোগিণীর জ্বর আসিয়াছে। বলিল, ক্লোরোফর্ম্মের প্রতিক্রিয়া, ভয় নাই।

জ্বর বাড়িয়া চলিল। চম্পা আবার দ্রুত কথা বলিতে লাগিল। বলিল, "মিষ্টার মোহান, আমি আপনাকে একটা কথা বল্‌তে চাই। হয় ত আমি বাঁচতে পারি, হয় ত বা নাও বাঁচতে পারি,—আমি আমার প্রাণের একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাই—"

বলিয়া ধীরে ধীরে ভীরুভাবে মোহানের হাতে তাহার হাত মিলাইল। সে শীর্ণ হাতখানির উষ্ণস্পর্শে মোহানের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল।......ধীরে ধীরে হাতখানা নামিয়া আসিল। মোহান দেখিল, চম্পার ঘুম আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিল। চম্পার দাদাকে বলিল, ঘুমের যেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত না হয়। বলিল, তিনি একা, তবে রোগিণীকে লইয়া এখন আর বেগ পাইতে হইবে না।

চম্পার দাদা মোহানকে বিশেষ ধন্যবাদ দিল। বলিল, তাহাদের বাড়ী হইতে পরদিন লোক আসিবার কথা ছিল। অপারেশন দুই একদিন পরে হইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ডাক্তার আসা মাত্রই তার বন্দোবস্ত করিলেন। লোক আসিয়া না পৌছাতে অসুবিধা

হইয়াছে। মোহানের সাহায্য না পাইলে সে কিছুই করিতে পারিত না। ইত্যাদি।

সেখান হইতে মোহান সোজা ঘরে গেল না, নিজের 'ডিউটি' সমাপ্ত করিতে চলিল। সেই দাড়িওয়ালা কালো লোকটিকে মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন দিয়া বিছানায় শোয়াইল, অপর একজনের দেহে যন্ত্র পাস করিয়া গুরুভারের লাঘব করিল, আর একজনের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া আবার বাঁধিয়া দিল।

মোহান শুধু নিজের 'ডিউটি' করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহার সমপাঠীদের কাজে সাহায্য করিতে লাগিল। সেদিন সে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হস্পিটালের প্রায় অধিকাংশ ওয়ার্ডেই ঘুরিয়া বেড়াইল। ঘরের দিকে যাইবার পূর্ব্বে শিশুর চীৎকার শুনিয়া 'ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে' গেল। দেখিল, নার্সেরা কেহই নাই, খাটে খাটে মায়েরা সব শুইয়া আছে, পাশে লোহার ফ্রেমে ঝোলানো পাল্‌নায় তাহাদের শিশুরা ঘুমাইতেছে। শুধু একটি শিশু চেঁচাইতেছে, তাহার দুর্ব্বল মা বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শিশুকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। মোহান 'ডায়েপার' শুদ্ধ শিশুটিকে হাতে লইয়া দোলা দিতে লাগিল। ধীরে ধীরে শিশুর কান্না থামিয়া আসিল।

এমন সময় দুইজন নার্স আসিল। মোহানের শিশু পালনের দৃশ্য দেখিয়া পিছনের নার্সটি সঙ্গিনীর ঘাড়ে দুই হাত রাখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহান চাহিয়া দেখিল, সেই অল্পবয়সী মেয়েটি, কালো মুখের ভিতর দুইপাটি কাগজের মত শাদা দাঁত! নার্সদেরে দেখিয়া সে শিশুটিকে তাহার পাল্‌নায় রাখিতে গেল। তখন শিশু আবার কাঁদিয়া উঠিল। মোহান তাই তাহাকে আবার তুলিয়া ধরিল। জিভ তালুতে লাগাইয়া টকাটক্‌ শব্দ করিয়া শিশুকে থামাইতে চেষ্টা করিল,

কিন্তু এ যে আট দশ দিনের শিশু, ওসব বোঝে না, তাহা বেচারী মোহানের জানাই ছিল না!

ওদিকে সেই তরুণী নার্স তো হাসিতে হাসিতে মাটীতে গড়াগড়ি যাইবার উপক্রম! বয়োজ্যেষ্ঠা নার্সটি মোহানের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার কাছে দিন্!" তখন মোহান শিশুর পা আগে দিবে কি মাথা আগে দিবে, তাহা লইয়া ফ্যাসাদে পড়িল। সে ঘরে যত খানা খাট তত জোড়া উজ্জল চক্ষু মোহানকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তরুণী নার্স হাসিয়া খুন হয় আর কি! মোহান ভারী অপ্রস্তুত হইল, এবং ভারী বিরক্ত হইল। ভাবিল, পুরুষের ওয়ার্ডে তো সকলে তাহার দিকে এমন ভাবে চায় নাই, কোনও কম্পাউণ্ডারকে তো তেমন ভাবে হাসিতে দেখে নাই। মনে মনে বলিল, "মেয়েমানুষদের কি সব ব্যাপার রে বাবা!" মোহানের বিরক্তির ভাব দেখিয়া হাস্যময়ী নার্সটি নিজেকে সংযত করিয়া চাপা গলায় বলিল, আমি বড় দুঃখিত, স্যার!" কিন্তু মোহান দরজার বাহিরে পা বাড়াইতে আবার তাহার হাসি প্রভাতের শেফালির মত অঝোরে ঝরিতে লাগিল!

মোহান ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বে আবার চম্পার ঘরে গেল। আস্তে আস্তে দরজার ভিতরে মাথা লইয়া শুনিল, চম্পা ঘুমাইতেছে। বোধ হয় জ্বরের জন্য একটু জোরে নিঃশ্বাস বহিতেছে। ভাবিল, এখন কোনও প্রকার গোলমাল না করাই সমীচীন।

মোহান বাহিরে সরু রাস্তা ধরিয়া চলিল। তার উপর ম্লান জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল। মোহানের চিত্ত এখন অপরিসীম তৃপ্তিতে ভরা।

সে হাউস্ সার্জ্জনের বাড়ী ছাড়াইয়া ধনী রোগীদের কটেজের পাশ

দিয়া চলিল। হঠাৎ একটা জানালার কাছে আসিয়া শুনিতে পাইল, ভিতরে কথা চলিতেছে—বাংলাতে !

"তোর ঘুম পায়নি, ছোট খোকা ?"

"না রে দাদা ! বাবা কি কর্চ্ছেন ?"

"পড়চেন।"

এ শিশুদের আলাপ যেন কোন্ স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। মোহান ভিতরে গেল, সৌজন্যের অপেক্ষা রাখিল না, কেননা, কোনও অলিখিত আইন অনুসারে বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালীর সতত অবারিত দ্বার—অবশ্য প্রবাসে।

মোহান খোকাদের সঙ্গে অলাপ করিল। বড় ছেলেটি বলিল, তাহার টন্‌সিল কাটা হইয়াছে। ছোটটি বলিল, "আমারও তন্‌সিল কাতা হয়েচে।" মোহান তাহাদের পিতার সঙ্গে পরিচয় করিল ও তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার ইচ্ছা জানাইল।

ঘরে আসিয়া মোহান টেবিলের উপরে ঢাকা দেওয়া রুটি ও মাংসের কিঞ্চিৎ আহার করিয়া বিছানায় শুইল। শোওয়া মাত্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ত্তব্যের শেষে ক্লান্ত দেহে গৌরবের নিদ্রা সে।

৭

মোহানের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন জানালা দিয়া রোদ আসিয়া তাহার টেবিলের উপর পড়িয়াছে। দীর্ঘ আট ঘণ্টা নিবিড় সুষুপ্তির পর তাহার গত দিনের খাটুনি, রক্তহানি, দেহের উত্তেজনা, সমস্ত শুধ্‌রাইয়া গিয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্রতাপে তাহার স্নায়ুমণ্ডলী সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সে দেহ হাল্কা বোধ করিল, তাহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চা খাইতে খাইতে মোহানের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ভাবিল, মাংস-রুটির ফল দেখা দিয়াছে, গ্ল্যাণ্ডের 'ইন্টারনেল সিক্রেশন' জোরে চলিয়াছে,—যদিও গত রাত্রে মাংস-রুটির অতি সামান্যই উদরস্থ করিয়াছিল।

মোহান যখন বাহিরে আসিল, তখন প্রভাতের মনোরম রোদে হাঁসপাতালটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অপারেশন ঘরের কাচের উপর হইতে একটা শুভ্র জ্যোতি নির্গত হইতেছিল। নূতন লেকচার হলটার লাল টালি বসন্তের বনে কৃষ্ণচূড়ার মত আকাশের মাঝে রাঙিয়া উঠিয়াছিল।

প্রভাতের কোমল স্পর্শ রোগীদের রোগযাতনার লাঘব করিয়া একটা সহজ স্ফূর্ত্তির ভাব জাগাইয়াছে। রুগ্না মাতা তাহার নবজাত শিশুর পাল্‌নায় দোলা দিতেছে, পা-কাটা পুলিসের জমাদার বারান্দায় বসিয়া শিশুদের খেলা দেখিয়া হাসিতেছে। এপেণ্ডিক্স-বিহীনা স্ত্রীর পাশে বসিয়া ভোরের ট্রেনে আগত স্বামী তাহাদের নূতন বাড়ীর সাজসরঞ্জামের বিষয় আলোচনা করিতেছে।

হাঁসপাতালের চেরিগাছগুলি ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। হাউস-সার্জ্জনের বাড়ীর বাগানের বেলীলতায় থোপে থোপে কলি আসিয়াছে, নিমের শাদা ফুলের পাঁপড়ি আর হল্‌দে পাতা ইটের লাল রাস্তাটির উপর যেন মিনার কাজ করিয়া রাখিয়াছে!

পথে দুই এক জায়গায় দেখিয়া শুনিয়া মোহান যখন ২৭নং ঘরের দরজায় গেল, তখন হঠাৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সে ঘরের সামনে আলেকজাণ্ডার দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাশে একটা 'স্প্রে' করিবার মেসিন। বারান্দার একধারে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া তরুণী কালো নার্সটি দাঁড়াইয়া আছে। মোহানকে দেখিয়া সে মাথা তুলিল, তাহার কালো ডাগর চোখদুটি দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে

লাগিল। সে রোরুদ্যমান মুখে রুমাল চাপিতে লাগিল, তাহার চক্ষুদুটি লাল হইয়া উঠিল।

আলেক্জাণ্ডার মোহানকে সব খবর দিল। মধ্য রাত্রে নার্স রিপোর্ট করে, রোগিণীর জ্বর প্রবল, নাড়ী ক্ষীণ। ডাক্তার আসিয়া ইন্‌জেকসন দিয়া যায়। কিন্তু শেষরাত্রে রোগিণীর 'হার্ট ফেল' হইয়া যায়। আলেক্জাণ্ডার বলিল, "অপারেশন খুব ভালই হয়েছিল, তবে ক্লোরোফর্ম্ম বেশী দিতে হয়েছিল, রোগিণী তার চোট সহ্য করতে পারেনি। এমন কেস্ হয়ে থাকে মাঝে মাঝে।" তারপর বলিতে লাগিল, "রোগিণীর অভিভাবক একজন অপদার্থ লোক, কিছুই করে' উঠ্‌তে পারে না। নার্স বল্‌ছিল, মরে যাবার আধ ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও সে মাথায় বরফই দিচ্ছিল!"

এ কথায় নার্সের রোরুদ্যমান, অশ্রুসিক্ত মুখখানি হঠাৎ অদম্য হাসিতে কুঞ্চিত হইয়া পড়িল!

আলেক্জাণ্ডার বলিল, "ঘরখানি সত্বর খালি হওয়া দরকার, আর একজন রোগীকে এ ঘর দেওয়া হয়েচে, তার বেলা ন'টাতে অপারেশন।"

চম্পার অভিভাবক বন্দোবস্ত করিতে বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিলে মোহান তাহার সাহায্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে ২৭ নম্বরের ঘরটি খালি হইয়া, নানাপ্রকারের "ডিস্-ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট" দ্বারা শোধিত হইল, এবং নূতন শুভ্র চাদরে সজ্জিত হইয়া নবাগত রোগীকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

৮

সেদিন মোহান যখন ঘরে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা। সে হাতে ছোট একমুঠা কাগজ লইয়া ফিরিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল, গুটিকতক কার্ড সাইজের ফোটোগ্রাফ—চম্পার শেষ

অবস্থার। নিজের হাত-ক্যামেরাটি দিয়া সে এই ছবিগুলি তুলিয়াছে। চম্পার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া সে ফোটোর 'নেগেটিব' গুলি লইয়া এক পরিচিত ফোটোগ্রাফারের বাড়ী গিয়াছিল, সেখানে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া তাহা "ডেভেলপ" ও "প্রিণ্ট্" করাইয়া আনিয়াছে।

মোহান ছবিগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া একে একে পরীক্ষা করিল। সেগুলির উৎকৃষ্টতা অনুসারে একের পর একটি রাখিল, তারপর খুলিয়া আবার দেখিল, আবার রাখিল।

তাহার মনের ভিতর শুধু জাগিতেছিল, শান্ত মধ্যাহ্নে মাঠের কোণে একটি ঘুঘুর নিবিড় প্রাণভরা ডাক,—আর একটা অজ্ঞাত, অস্পষ্ট অথচ গভীর ব্যথা। ছবিগুলি সাম্‌নে রাখিয়া মোহান বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার উজ্জ্বল চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল।

এক ফোঁটা জল একখানা ছবির উপর পড়িয়া তার একদিক কতকটা ঝাপ্‌সাইয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোষ কাগজ আনিয়া তাহা চোষ করিল, এবং কাপড়ের খুঁট দিয়া আবার মুছিল।

মোহান অতৃপ্তভাবে সে ছবিখানা দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে কি একটা ভাবনা জাগিল। সে ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানা ছোট ছবির এলবাম বাহির করিল।. ক্রিষ্টমাসে এক পাদ্রীসাহেব তাহা তাহাকে উপহার দিয়াছিল, তাহাতে সাধুসন্তের ছবি ছিল। মোহান একখানা একখানা করিয়া সবগুলি ছবি খুলিয়া ট্রাঙ্কে একটা বইয়ের ভিতর রাখিল। তারপর সে এলবামেতে চম্পার সবগুলি ছবি ধীরে ধীরে লাগাইল। ছবিগুলি লাগাইয়া এলবামখানা বন্ধ করিয়া টেবিলের ড্রয়ারে রাখিল। তাহার মনে একটা তৃপ্তি আসিল।

তখন হঠাৎ কে দরজায় করাঘাত করিল। দুই দরজার ফাঁক দিয়া

বহু এসিড ও লোসন রঞ্জিত ছুইটি আঙুল ঢুকিল, ও সে ফাঁকটি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইলে তার ভিতর আলেক্জাণ্ডারের ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা দেখা গেল। আলেক্জাণ্ডার বলিল, "মোহান আছ ?"

মোহান ব্যস্তসমস্তভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এস।"

আলেক্জাণ্ডার ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "মিস্ ঘোরগেরীকর ; মিষ্টার মোহান।" বলিয়া তাহার পিছনে দাঁড়ানো মেয়েমানুষটির প্রতি চাহিয়া, "আমার বড্ড কাজ, যাচ্চি" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মোহান মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দেখিল, এতক্ষণ যে ছবিখানা দেখিয়াছে, তারই জীবন্ত প্রতিকৃতি, সজীব, উজ্জ্বল নূতন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ! সেই গভীর ডাগর চোখদুটি, কিন্তু কোটরগত নয় ; সেই মসৃণ গালদুটি, কিন্তু শীর্ণ নয়, ম্লান নয়, পুষ্ট, নধর, গাঢ় গোলাপী। নাকটি তেমনই তীক্ষ্ণ, তবে কত কোমল, কত মাধুর্য্য-মাখা ! ঠোঁট দুটি তেমনই রেখার ন্যায়, কিন্তু ফুলের পাপড়ির মত মোলায়েম। তেমনই চিক্কণ কালো চুল, কিন্তু মুষ্টিমাত্র নয়, বড় খোঁপায় ঘাড়ের উপর জড় হইয়া আছে। কপালের উপর চূর্ণ-কুন্তল বিছাইয়া পড়িয়াছে ! বক্ষোদেশ "দরিদ্রাণাং মনোরথ ইব" নয়, নব যৌবনের গৌরবে দৃপ্ত ! যেন মর দেহখানি. কোন অমর লোকের বৈতরণীতে স্নান করিয়া স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে !

মোহান চমকিতভাবে বলিল, "মিস্ ঘোরগেরীকর ? চম্পা ?"

তরুণী বিষণ্ণভাবে মোহানের চোখে চোখে চাহিয়া বলিল, "আমি মিস্ শারদা ঘোরগেরীকর। চম্পা আমার বড় বোন ছিল।"

মোহানের চমক ভাঙিল। সে বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি বুঝি আহ্মদনগর থেকে এসেচেন ?"

শারদা বলিল, "না, পুণা থেকে। আমি সেখানে কলেজে পড়ি। আমার টার্ম্ম নষ্ট হবে বলে কাল আসিনি। কিন্তু আজ আসা বৃথা হ'ল।"

তাহার সুকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত হইল। সে একখানা ছোট রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

মোহান দেখিল, চম্পা এম্‌নি করিয়া চোখের জল মুছিত, কাঁদিবার সময় এম্‌নি করিয়া তাহার ঠোঁট ভাঙ্গিয়া পড়িত, নাসারন্ধ্র ফুলিয়া উঠিত!

শারদা বলিল, "আমরা গত একবছর থেকেই তার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ছিলাম, আপনারা তাকে বাঁচাবার জন্যে কি না করেচেন!" সে তাহার দাদার কাছে মোহানের উদারতার কথা শুনিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছে। বলিল, "আমরা কোনদিনও আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না।"

মোহান লক্ষ্য করিল, শারদার কথার সুর চম্পারই মত, শুধু একটু বেশী সতেজ; যত করুণ, তার চেয়ে বেশী মিষ্টি।

শারদা বলিল, "দাদার কাছে জানলাম, আপনি দিদির শেষ কালের কয়েকখানা ফোটো নিয়েছেন।"

মোহান বলিল, "হ্যাঁ, তবে সে গুলি ভাল হয় নি।"

শারদা বলিল, "আমি তার একখানা চাই।" বলিয়া তাহার দিকে যাচ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি করিল। চম্পারই মত দৃষ্টি, তবে শারদার চোখদুটি টল-টলে, আর তাহার গালদুটি অতিশয় লাল হইয়া পড়ে।

মোহান বলিল, "তা দেব'খন। আচ্ছা, আপনার দিদির কোনও ফোটো আছে,—অসুখ হ'বার আগেকার?"

শারদা বলিল, "আছে, একখানা। দিদি তখন সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেচে।"

মোহান বলিল, "তখন আপনার মত বয়স ছিল ?"

শারদা বলিল, "হ্যাঁ।"

মোহান বলিল, "তা হ'লে দেখ্‌তে অনেকটা আপনারই মত ছিলেন, বোধ হয় ?"

শারদা মাথা নোয়াইল। বলিল, "সম্ভবতঃ। লোকে বলে আমাদের চেহারায় খুব সাদৃশ্য আছে।"

মোহান বলিল, "আমি শুধু কৌতূহলের জন্যে বল্‌ছি, মাফ করবেন,—আচ্ছা বলুন তো, আপনার দিদি যখন সুস্থ ছিলেন, তখন লোকে আপনাদের দুজনার মধ্যে কা'কে বেশী সুন্দরী মনে করত ?"

শারদা ঘাড় নোয়াইল। তাহার ঠোঁট দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। সে বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল, "তা' আমি বলতে পারি না।"

মোহান একটু বাধা পাইয়া বলিল, "আপনার স্বাস্থ্যটি বেশ; দেখ্‌বেন, আপনার দিদির মত যেন তা' খুইয়ে না বসেন।"

শারদা বলিল, "আমার কোনোদিন অসুখ হয় না।"

মোহান ড্রয়ার হইতে এলবামটি খুলিল। খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ছবি তুলিল। বলিল, "এ ছবিতে আপনার দিদির প্রতি অন্যায় করা হয়। তিনি অসুখের সময়ও এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর ছিলেন।—অবিশ্যি আপনার মত নয়।"

শারদা কম্পিত হস্তে ছবিখানা হাতে লইল। লইয়া তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল। মুহূর্ত্তের তরে, তাহার মনের গোপন কোণে, তাহার অজ্ঞাতসারে, সেই তুচ্ছ কালীর ছাপটি যেন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল।...

শারদা মোহানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইল। বলিল, তাহার